এক

গোটা বোশেখ মাসে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি—কাল-বোশেখী ত নয়-ই। জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকেও না। তখন দু'এক ফোঁটা জল পড়েছিল কিনা তাও কারও মনে নেই। পড়ে থাকলে সেও লোকে ভুলে গেছে। মনে আছে শুধু খরা।

প্রখর খরায় পুড়ছে, শুকোচ্ছে সারা দেশটা ; কবে থেকে কেউ মনে করতে পারে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেছে লোকে। হতাশ হয়ে গেছে। মেঘ কুড়িয়ে কাজল পরার স্বপ্ন নিয়ে এখন আর কেউ আকাশে চোখ পাতে না।

কি দেখবে! ওই ত ময়দানে মনুমেণ্টটা আকাশে গর্ত খুঁড়ছে। ওই ত রেড রোডের গাছগুলি আকাশে ছবি আঁকছে। ওই ত দু' চারটে কাক চিল শালিক শূন্যে বাতাস কুড়োচ্ছে। আর কোথায় কী! ধোঁয়া আর ধুলোয় মেশানো একটা বিষণ্ণ রঙ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে নাকি।

তাপে পোড়ে। ঘামে ভেজে। মানুষগুলি গুমট গরমে ঘরে বসে অপ্রসন্ন হয়ে থাকে সারাদিন। বিকেল পড়লে ফুর্‌ফুরে একটু হাওয়া বয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মানুষ বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। ছড়িয়ে পড়ে মাঠে ময়দানে। তাদের আগেই এসে তৈরি হয়ে থাকে চিনাবাদাম ফুচকাঅলা, পান সিগ্রেটঅলা, কুলপি-মালাই-আইস-ক্রিমঅলা। এরা মেলা মেলায় রসনার তৃপ্তি দিতে। একটু পরে

বাসনার তৃপ্তি দিতেও আসে একদল। রঙিন সাড়িতে, পাউডার-কাজল-লিপস্টিকে উজ্জ্বল সাইনবোর্ডের মতন তাদের ঘিরে সোচ্চার একটা ইশারা থাকে। বিকেল হলে তাই মনে হয় না মানুষ বর্ষা চায়, এই বৃষ্টিহীন তপ্ত দিনে তারা অসুখী।

তার প্রমাণও পাওয়া গেল এখনই। সকলের অজ্ঞাতে আকাশের এক কোণে এক টুকরো মেঘ জমেছিল। এখন যেন কে তার গায়ে ফুঁ দিল। আর দেখতে দেখতে সেই ছোট্ট মেঘটুকু ফুলে ফেঁপে মস্ত বেলুন মতন হয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে ফেলল। শেষে ফেটে গেল। সেই ফাটল থেকে বেরিয়ে এল ঝড়। বৃষ্টি পড়তে লাগল। মাঠে ময়দানে হাওয়া খাচ্ছিল যারা, যারা বেচাকেনা করছিল, খদ্দেরের আশায় মুহূর্ত গুনছিল যারা, সকলের ভ্রূ বেঁকে গেল। মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। যে-কোন-একটা আশ্রয়ের আশায় দিগবিদিকে ছুটল সকলে।

খ

'আচ্ছা আপদ ত!'

'সত্যি এ কোন্ ইয়ার্কি!'

'বলা নেই কওয়া নেই হুট্ করে এসে গায়ে মুখে··'

'তবু যদি ইয়ে দিত।'

কমলা আর উষা ছুটছিল আর বলছিল। স্ট্যাচুটার কাছে ঝোপের ধারে ঘুর্ঘুর্ করছিল ওরা। সেখান থেকে ছুটছিল।

কমলার কথায় ভ্রূ উঁচু করে একটা ছোট্ট ধমক দিল উষা। দৌড়োতে না হলে একটা চড়ই দিত বুঝি।

'তোর কেবল পয়সা আর পয়সা।'

পয়সা না হলে তোরই কি চলে নাকি! চললে এ পথে আমরা এলাম কেন? বলত কমলা। কিন্তু বলতে পারল না। তখনও ধুলোর ঝড় বইছিল। এখন জল এল। বড় বড় ফোঁটা ছোট ছোট টোপা-কুলের মতন এসে পড়ছে ওদের গায়ে মাথায়।

'ধুলোয় আর জলে এর মধ্যেই সাড়িটা কী হয়ে গেছে ত্থাখ্।' কমলা বলল। বলতে বলতে বুঝি কমলার চোখেও জল এল।

'আর দেখতে হবে না। এখন তুই আয় ত।'

উষা আরও জোরে দৌড় দিল। উষা এসে দাঁড়াল এক নম্বর শেডের তলায়। একটু পিছে কমলাও এসে দাঁড়াল।

দু'জনেই হাঁপাচ্ছে।

কমলা দম নিতে নিতে বলল, 'ভিজে কী হয়ে গেলাম!'

নিজের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে উষা বলল, 'কাক।' হাসল একটু সে।

কমলা বলল, 'ভিজে দাঁড়কাকের মতন এখানে দাঁড়িয়ে আমরা সঙ্ হয়ে থাকব, আর যত লোক আমাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। দেখতে দেখতে বাড়ি চলে যাবে।'

'যাবেই ত! দুর্যোগে কে পথে ঘাটে থাকে!'

সত্যি কেউ থাকে না। কমলা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। শুধু ওদেরই বুঝি পথ ছাড়া গতি নেই।

'আমরাও বাড়ি চলে যাই, চল।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উষা বলল।

'তুই যা।'

কমলা অন্য দিকে তাকিয়ে বলল।

'তুই যাবিনে?'

উষা স্তব্ধদৃষ্টিতে কমলার দিকে তাকাল। কমলার মুখ দেখতে পেল না। কমলা যে দিকে তাকিয়ে ছিল সে দিকে চোখ

তুলল উষা। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডালগুলি এলোপাথাড়ি মাথা কুটছে। মানুষগুলি এলোমেলো ছুটোছুটি করছে। ধুলো আর বৃষ্টির রেণুতে আকাশ মাটি জুড়ে একটা ছাই রঙের পর্দা পড়েছে। সেই পর্দা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ট্রামগুলি আদিম কালের কোন গোঁয়ার জন্তুর মতন আসছে, চলে যাচ্ছে। জালের মতন করে বোনা মাথার ওপরকার ট্রামের তারগুলিকে লোহার মোটা থামগুলি টান টান করে ধরে আছে। ঝড়ের আকাশটা ভেঙে পড়লে তাকে ঠেকানর জন্যে যেন রুখে আছে। ঝড়ের দাপটে সামিয়ানার মত খাটানো তারের জালটা দুলছে কাঁপছে।

'এর পরে কিন্তু রাস্তায় জল দাঁড়াবে। ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে। একটু পরে বাসও বন্ধ হবে।' উষা ফের বলল।

'তুই চলে যা না হতভাগী।' কমলা এবার মুখ ঘুবোল। দুই চোখে পূর্ণদৃষ্টিতে উষাকে দেখল। 'তুই যা।' হাসল কমলা। 'আমি যাব না।'

'তুই যাবিনে?' অবাক হল উষা। 'তুই থাকবি কোথায়?'

'থাকব আর কোথায়? কে আর আমায় শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলছে! আমিও যাব। পরে যাব।'

'পরে যাবি কি রে, কেমন করে যাবি?'

'হেঁটে হেঁটে।'

নির্বিকার গলা কমলার। বলে সে একটু হাসল। সে আগে থেকেই মিটি মিটি হাসছিল! আরও একটু হাসল।

সে হাসি দেখে উষা ভ্রূ বাঁকাল। তার রাগ হয়েছে।

'হেঁটে যাবি কিরে, টালিগঞ্জ কি এখানে?'

'যেখানেই হোক যেতে হবে। আর বাস ট্রাম না থাকলে হেঁটে ছাড়া যাব কী করে। আমাকে কে আর মাথায় করে নিচ্ছে।' কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। কমলা মুখ ঘুরিয়ে রইল।

উষা একটু পেছনে হটে গেল। পেছনে হটল অনেকেই। বলতে গেলে একসঙ্গে অনেকেই একটু পিছু হটল। যে হটতে পারল না সে জামা-কাপড় সামলে সংকুচিত হল—কারো কাঁধের পিছে, মাথার নিচে আড়াল খুঁজল। কমলা নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। কেবল সাড়িটাকে সায়া শুদ্ধ টেনে হাঁটুর কাছে আনল। মাথাটাকে একজনের ঘাড়ের তলায় সরিয়ে রাখল। জল খুব নয়। ঝড়। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টিকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে চারধারে। হাওয়ার ঝাপটায় শেডের নিচে থেকেও তাই সবাই বিব্রত তটস্থ। ঝাপটায় ঝাপটায় লোক চঞ্চল হয়ে উঠছে। হটছে, সরছে ডাইনে বাঁয়ে পিছে, যে দিকে একবিন্দু জায়গা পাচ্ছে। গায়ে গায়ে জমাট বেঁধে গেছে জনতা।

উষা বলল, 'এখানে থাকলে আর মাথা বাঁচানো যাবে না।'

কমলা উষার দিকে তাকাল। উষার মুখ দেখতে পেল না। উষা সযত্নে মুখ আড়াল করে আছে। কমলা বুঝল। উষা যা বলতে চায় সে অন্য কথা। তারও সেই ভয়। মুখে যদি জল লাগে তবে যেটুকু আশা এখনো অবশিষ্ট আছে মুখের রঙের সঙ্গে তাও ধুয়ে যাবে।

এতক্ষণ চুপচুপ কথা বলছিল ওরা। এখন বড় গলা শুনে চমকে উঠল কমলা।

উষা শুধোল, 'দাদা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাতা খুলছিলেন। উষা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, 'দাদা, আপনি যদি আমাকে ওই ঘড়ি-ঘরে পৌঁছে দেন...'

ভদ্রলোক ছাতা মাথায় তুলে বললেন, 'আমি ত মা শিয়ালদার ট্রামে উঠব', আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন, 'ওই যে আসছে।'

'আপনি তিন নম্বর শেডের থেকে উঠবেন ত? আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন', গলায় অনুনয় উষার, 'এখানে দাঁড়াতে পারছিনে।' গলার স্বরে চোখের দৃষ্টিতে কথাটার অর্থ বোঝাতে চাইল উষা।

ভদ্রলোক বুঝি বুঝলেন। যে ভীড় উষাকে ঘিরে আছে সে দিকে একবার তাকালেন, কি চিন্তা করলেন একটু, ভ্রূকুটী করলেন। হয়ত ওকে নিয়ে গেলে নিজেকে ভিজতে হবে কিনা ভাবলেন, তবু মেয়েছেলের অনুরোধ কী করে ঠেলে ফেলেন তাই ভ্রূকুটী করলেন, বললেন, 'বেশ, এস।'

কমলার চোখ টাটিয়ে উঠল—বেশ ম্যানেজ করে ফেলল ত উষা। কিন্তু তখনই মনে হল, না, ভদ্রলোককে দেখে ত সে-জাতের মনে হয় না। তাহলে এক নম্বর শেডের সঙ্গে তিন নম্বর শেডের কী পার্থক্য বুঝল না কমলা। ভ্রূ কুঁচকোল সে। তখনই মনে পড়ল, উষা বলছিল বটে, সে সেখান থেকে ঘড়ি-ঘরে যাবে। সেও কি ঘড়ি-ঘরে যাবে? ঘড়ি-ঘরের দিকে তাকাল কমলা। সেখানে অনেক লোক। না। ঠিক করে ফেলল কমলা। ও গেছে, ও যাক। এক জায়গায় দু'জন না থাকাই ভাল। কার মানুষ কে নেব ভেবে আমরা যেমন দ্বিধায় পড়ি, উৎসুক মানুষেরও সেই দশা হয়ঃ কাকে ছাড়ে কাকে ধরে। শেষে কেটে পড়ে। একটি উৎসুক লোককে কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিল কমলা।

গ

কমলা একটা ঝাপটা হাওয়ার অপেক্ষা করছিল। থেকে থেকে আসছিল। এবার যেই এল অমনি সেই 'উৎসুক' লোকটির পেছনে আরও একটু ঘন হয়ে দাঁড়াল কমলা। অনেকক্ষণ থেকে এ লোকটি

কমলার বুকের কাছে। উস্‌খুস্‌ করছিল লোকটি। কখনো কখনো তার পিঠ-পাঁজরাও কমলার বুকে ঘষে গেছে। সে কি ইচ্ছে করেই না জলের ঝাপটা সামলাতে, কমলা এবার যাচাই করবে। চোখের কোণে লোকটিকে ভাল করে দেখল কমলা। চেহারায় পোশাকে শাঁসালোই মনে হল। আশায় বুক ভরে উঠল কমলার।

এখন লোকটির বগলের তলা, পিঠ পাঁজরা বারে বারে ঘষে যাচ্ছে কমলার বুকে, কাঁধে। কিন্তু লোকটির মুখ, চোখ দেখতে পাচ্ছে না কমলা। তার মুখ চোখের ভাষা পড়তে পারছে না। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ চলবে না। অথচ লোকটি যেন ইচ্ছা করেই মুখ ঘুরিয়ে আছে। কিন্তু পেছনে যে একটি মেয়েমানুষ আছে সর্বাঙ্গ মন দিয়ে সেইটেই যেন অনুভব করছে লোকটি। সে অনুভবে জ্বালা ধরিয়ে দিতে চাইল কমলা।

হঠাৎ যেন একটা শূয়র গোঁ গোঁ করে উঠল। ঘাড় নিচু করে একটা ষাঁড় ফুঁসে উঠল তাল ঠুকে। কমলা চমকে উঠল। লোকটা চমকে উঠল। শেডের তলার সকলেই চমকে উঠল। ফিরে তাকাল।

'ও মশায়, আপনার পেছনে যে 'লেডিস্‌' দেখতে পান না? ইডিয়েট, রাস্কেল, ঘুষির চোটে নাক উড়িয়ে দেব হারামজাদা। দাঁত খুলে ফেলব একটা একটা করে।'

হাতা গোটান বেশ জোয়ান একটি যুবক। কমলার বুক কেঁপে উঠল। কমলা সংকোচে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

কে একজন বলে উঠল, 'পেছনে থাকলে দেখবে কি করে মশাই?'

'দেখতে পায় না!' ভেংচি কেটে গর্জে উঠল ছেলেটি, 'দেখতে পায় না কিন্তু পিঠ দিয়ে ত দিব্যি চেপে ধরতে পারে।'

'কে, কে মশাই?'

এক সঙ্গে অনেকগুলি গলা খেঁকিয়ে উঠল।

এবার লোকটার মুখ দেখতে পেল কমলা। ফর্সা মুখ। এখন ভয়ে লজ্জায় বাইরের আকাশের মত সীসে রঙ। খুব ভয়ে চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। সেই ভয়-চোখে কমলাকে দেখল লোকটি এবার। মুহূর্তমাত্র দেখল। অথবা বোধ হয় দেখল না। অমনি তাকাল। লোকটির চোখ দুটি কমলার খুব ভাল লাগল। কিন্তু দেখতে পারার মত নয় তখন সে চোখ। সে চোখে লোকটা সকলের মুখই দেখল। কী দেখল সে-ই জানে। হঠাৎ দৌড় দিল। সেই ঝড়, সেই জলের মধ্যে মার-খাওয়া, তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত ভোঁ দৌড় দিল। পেছন থেকে শেয়ালের মত ডেকে উঠল অনেকগুলি লোক। শেডের সব লোক।

একজন বলে উঠল, 'যেতে দিলেন কেন মশায়, থবে দিলেন না কেন আচ্ছা মতন দু' ঘা?'

যুবকটি তার ঘুষি উঁচিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম খুলে রেখে দেব দুটো দাঁত। তা পালিয়ে গেল যে!' হেসে উঠল সে। 'ওই দেখুন এখনও দৌড়োচ্ছে।'

সত্যি লোকটা তখনও দৌড়োচ্ছিল। কমলা মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে দেখল। কিন্তু সেও আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াতে পারছিল না। তার বুক কাঁপছিল। সেও যদি ধরা পড়ে যেত। এখনও যদি ধরা পড়ে যায়। কমলা ভয়ে আরও আড়ষ্ট হল। তার তলপেট থেকে একটা বরফ-ঠাণ্ডা শীত যেন উপর দিকে ঠেলে উঠতে লাগল। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এ ভাবে এখানে ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না কমলা। সবাই তাকে দেখছে। কেউ যদি চিনে ফেলে। একটা ভয়ানক আশংকায় তার পা কাঁপতে থাকল। মরিয়া হয়ে সে বলল, 'আমাকে দয়া করে তিন নম্বর পৌঁছে দিন।'

যুবকটি বলল, 'আমার ত ছাতা নেই।' স্বরটা কেমন মিইয়ে গেল যুবকটির। কথাটা বলতে কোথায় যেন দুঃখ পেল। ছাতা না থাকার জন্যে দুঃখ জীবনে যেন সে এই প্রথম পেল।

ঘ

বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করবার মতন মুখের ভাবখানা, একজন লোক ছাতা খুলে এগিয়ে এল। যুবকটির থেকে কয়েক বছরের বড় হবে, লম্বা পাতলা চেহারা লোকটির। তার হাতে কয়েকখানা নতুন বই। বলল, 'আমি রাজাবাজারের ট্রাম ধরব। আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। আপনি অনুগ্রহ করে বই ক'খানা ধরুন, আমি ছাতা ধরছি।'

কমলা যেন বেঁচে গেল। তার চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে বই ক'খানা নিল সে। মাথা নিচু করে ছাতার মধ্যে এসে ঢুকল।

শেড থেকে বেরুতেই ঝড় আর জল চেপে ধরল তাদের। তারই মধ্যে কোন মতে এগোতে থাকল তারা। এক নম্বর শেডের দক্ষিণ কোণ থেকে তিন নম্বর শেড আর কতটুকু দূর। কিন্তু কমলার মনে হতে লাগল এর বুঝি শেষ নেই। ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে এসেছে এবার ফুটপাথে উঠবে তখন ঝড়ের একটা প্রবল ঝাপটা এসে থামিয়ে দিল তাদের। লোকটি ছাতার প্রায় সবটা দিয়েই কমলাকে আড়াল করে রাখল। কমলার মুখ বুক বাঁচল কিন্তু হাঁটু থেকে সাড়িটা ভিজে গেল। লোকটির ভিজল সারা গা। ডানদিকের গোটা অংশ ঘাড় থেকে পা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

কমলা লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বলল, 'ছি ছি কী করলাম বলুন ত! আপনাকে এই জলের মধ্যে বের করে এনে একেবারে ভিজিয়ে দিলাম।'

'ধ্যাৎ, কি যে বলছেন। আপনি বের করে আনবেন কেন, বরং আমিই আপনাকে বের করে এনে ভিজিয়ে দিলাম। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তাম, ওই দেখুন ট্রাম এসে গেছে, ওটাতেই আমি উঠব।'

'উঠবেন এটুকু হেঁটে গিয়ে ত? কিন্তু আমরা এগুতে পারছি কই!' বলে কমলা হাসল। লোকটির দিকে তাকাল। তার মুখ দেখল। লোকটিও তখন তাকিয়েছে। কী দেখেছে কমলার চোখে, চঞ্চল হয়ে উঠল। ছাতার ফাঁক দিয়ে এক নম্বর শেডের দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর ট্রামটা মিস করা তার পক্ষে যেন প্রায় অসম্ভব এমনি ব্যস্ত গলায় বলে উঠল, 'আসুন আসুন ট্রামটা এসে গেছে।' বাঁ হাত দিয়ে কমলার কাঁধ ধরে নিকটে টেনে নিল তাকে লোকটি। লোকটির ট্রাম ধরার চাইতে কমলাকে ধরার উৎসাহটাই যেন কিছু বেশি মনে হল কমলার। তিন নম্বর শেডে আসতে আসতে ট্রামটা ছেড়ে দিল। এমনই একটা সম্ভাবনা অনুমান করেছিল কমলা। সে হেসে উঠল, 'ওই যাঃ আপনার ট্রাম ছেড়ে দিল।'

লোকটিও হেসে উঠল, 'যার জন্যে এমন বেড়াল-ভেজা হয়ে এলাম তাই হাত ছাড়া হয়ে গেল।'

কমলা বলল, 'ধরতে চাইলে কি আর হাত ছাড়া হয়? আপনি ধরতে চাননি।'

'তাও বটে, কিন্তু হাত বাড়ালেই কি পাওয়া যায়!'

'কেন, পাননি?' বলেই কমলার ভয় ভয় করল। এখনই এমন কথা বলার মত ঘনিষ্ঠতা লোকটির সঙ্গে হয়েছে কিনা ভাবল। ভীরু চোখ দুটি তুলল লোকটির দিকে।

লোভ-চকচকে দুটি চোখ মেলে লোকটি তাকিয়ে ছিল তার দিকে, কমলা চোখ তুলতেই সে হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, পেয়েছি।' ট্রাম
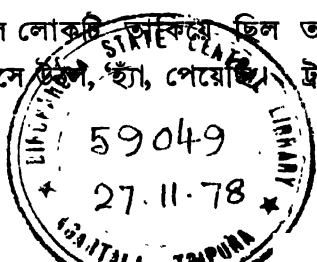
মিস করেছি কিন্তু···সে কমলার হাত ধরল। গলায় অন্তরঙ্গ স্বর, 'আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, চল, কে সি দাসের দোতলায় বসে নিরিবিলিতে ছু'জনে ছু'কাপ কফি খাই আগে।'

ছু'জনে আবার বেরিয়ে পড়ল। এবার লোকটির হাত কমলার কোমরে। কমলা তার বুকের মধ্যে। লোকটি তার কোমরে একটু চাপ দিয়ে বলল, 'তোমাকে চিনতে তাহলে আমি ভুল করিনি। ঠিক অনুমান করেই তোমার দিকে আমি ছাতা মেলে ধরেছিলাম। কি বল?' লোকটির হাত আর একটু উপরে উঠে এল।

কমলা কিছু বলল না। কমলার এবার আর ভয় করল না।

দুই

উষা তিন নম্বর শেডের আর এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। কমলা কখন এসে শেডে ঢুকেছিল উষা দেখেনি। যখন লোকটির ছাতার তলায় ঢুকল তখন কমলাকে দেখতে পেল উষা। উষা হাসল। খুব মজা হবে। ঘড়ি-ঘরে গিয়ে কমলা উষাকে খুঁজবে। পাবে না। উষা ততক্ষণে ছাতা মাথায় ঘড়ি-ঘরের দিকে যাচ্ছে এমন একজন পাবেই। তখন তার সঙ্গে সে ঘড়ি-ঘরে যাবে। গিয়েই কমলার হাতে ধরা দেবে না। কতক্ষণে কমলা তাকে খুঁজে পায় উষা দেখবে।

কমলা কার ছাতার তলায় যাচ্ছে। উষা দেখছিল। দুটো শরীর এক হয়ে গেছে। কমলার বড় দুঃসাহস। উষা ভাবল। ওকে সাবধান করে দিতে হবে। ও কি পুলিশের হাতে পড়তে চায়। হাজত জেল খাটতে চায়। ওর গায়ে-পড়া এই কাণ্ড দেখে লোকটা যদি হঠাৎ ক্ষেপে যায়, কে ও জানতে চায়। কী যে কাণ্ড হবে তখন! শিউরে ওঠে উষা।……কিন্তু ওকি, ওরা বাঁক নিল কেন? ঘড়ি-ঘরে ঢুকবে না কমলা? কমলা কোথায় যাচ্ছে? কমলা তাহলে…কমলা কী…। দু' চোখে বিস্ময় উষার। দুটো চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে উষার। উষা চেয়ে আছে। উষার চোখে পলক নেই। একটা ট্রাম এসে উষার অপলক দৃষ্টি আগলে দাঁড়াল। ট্রামটা যখন সরে গেল, একটা ছাতার নিচে এক-হয়ে-যাওয়া দুটো

শরীর আর দেখতে পেল না উষা। উষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখটা কর্‌কর্‌ করে উঠল উষার। তারপর স্যাঁৎসেঁতে হল। জলে ভরে উঠল চোখ। নাঃ, উষাকে দিয়ে কিছু হবে না। সে কিছু করতে পারবে না। এ লাইনের যোগ্যতা নেই তার।

উষা হয়ত আরও ভাবত। বড় ভাবপ্রবণ মেয়ে এই উষা। একটুতেই চোখে জল আসে। ব্যথায় বুক ভরে যায়। তাই সে আরও ভাবত হয়ত। দুঃখের ভাবনা যখন আসে, দল বেঁধে একযোগে হুড়মুড় করে আসে। ঠেকানো যায় না। বারণ করা যায় না। উষাও বারণ করতে পারত না। ঠেকাতে পারত না। পেশা ছেড়ে দিলে কী খাবে এ ভাবনা—খাওয়ার ভাবনা কে-ই বা না ভেবে পারে। ঘরে শয্যাশায়ী বুড়ো মা থাকলে তার ভাবনাই বা কোন্ সন্তান না ভেবে পারে। কিন্তু এসব ভাবনা উষা বাইরে এসে বড় সহজে ভাবে না। ভাবতে চায় না। বেরোবার আগে যখন সে তার বাড়িতে পরার ছেঁড়া ময়লা সাড়িটা ছেড়ে ফেলে তখন এ ভাবনাগুলিকে সে ঝেড়ে ফেলে তার সঙ্গে। বাইরে বেরোবার কালে ভাবনাগুলিকে শিকল তুলে ঘরেই বন্দী করে রেখে আসে। আজ সে-বন্দী ভাবনাগুলি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে এক সঙ্গে এসে হানা দিয়েছিল তাকে।

বিষণ্ণ মুখের মত আকাশ। দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাস। চোখের জলের মত বৃষ্টি। বাড়ি-মুখো মানুষগুলির আর-কোন-দিকে-না চাওয়া ব্যস্ততা। নিঃসঙ্গ একা একা দাঁড়িয়ে থাকা। বন্দী চিন্তাগুলিকে মুক্তি দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপরে কমলার অভিসার। এ দুর্যোগেও যে কমলা শিকার ধরতে পারে এই সদ্যোলব্ধ জ্ঞান উষাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কমলা থাকলে হয়ত বলত, 'তুই শিকার খুঁজিসনে পাবি কেমন করে? গায়ে পড়ে কেউ যদি এসে ধরা দেয় তবেই। আর তেমন ভাগ্য রোজই হবে,

দুর্যোগেও হবে, তা ত নয়। ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়তে হয়।'
কিন্তু উষা যে ভাগ্য গড়তে জানে না। তাই ভাগ্যের হাতে কেবলই
সে মার খেয়ে আসছে। এই মার খেতে খেতেই একদিন সে মরবে।
কেমন করে মরবে, কত কষ্ট তার অদৃষ্টে আছে উষা জানে না।
আজও হয়ত সেই অজানা কথাটাই আর একবার ভবিষ্যতের অন্ধকার
থেকে হাতড়ে হাতড়ে তুলবার চেষ্টা করত। কিন্তু এত দুঃখ তাকে
পেতে হল না। ট্রামটা যখন সরে গেল এবং কমলাকে যখন আর
সে দেখতে পেল না তখন, তার একটু পরে বৃষ্টির রেশম-কুয়াশার
ওধারে আর একখানি মুখ দেখতে পেল উষা। খুব ভাল দেখা
যাচ্ছে না। তবু চিনল। রমেশদা।

খ

উটকো হয়ে বসে আছে রমেশ। চিনির বোতল, চায়ের টিন আর
মাটির ভাঁড় বোঝাই কাঁধের ঝোলাটা এখন মাটি ছুঁয়ে আছে।
একপাশে কাঠ কয়লার গোল ছোট্ট লোহার উনুনের ওপরে একটা
মাঝারি পিতলের কলসি। কলসির পেটে লম্বা সরু নল। নলের
মুখে ভাঁড় ধরছে, ভরছে কি ভরছে না খদ্দেরের হাতে তুলে দিচ্ছে।
অনেক খদ্দের। জমাট জনতা। তিরিশ চল্লিশ জন হবে, না কি
তারও বেশি। এই ঝড় জলে আটকে পড়ে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে
থাকতে সবারই বুঝি গলা শুকিয়ে উঠেছিল। ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছিল
গা। চা দিয়ে এখন গলা ভিজাচ্ছে তারা। গা গরম করছে।

ঝড়ো হাওয়ায় ভর করে ফুটন্ত চায়ের স্বাদ বুঝি উষারও জিভে
এসে লাগল। উষা ঢোঁক গিলল। না। ঢোঁক গিলতে পারল না
উষা। গলাটা শুকনো। শুকনো কাঠ। এক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে

তারও কি গলা শুকিয়ে উঠেছে। কই এতক্ষণ ত কথাটা মনে হয়নি উষার। ওই চা দেখেই বুঝি পিপাসা পেল তার। না। উষার মনে পড়ল। অনেক আগে থেকেই উষার পিপাসা পেয়েছে। ঝড় উঠবার মুখে সে দৌড়েছিল। সে আর কমলা। পাছে ভিজে গিয়ে এই সাজগোজের পুঁজি ধুয়ে মুছে যায়। প্রাণপণে দৌড়েছিল তারা। তখনই গলা শুকিয়েছে। সেই থেকেই শুকনো গলা। কমলার শুকনো গলা এতক্ষণে নিশ্চয় ভিজেছে। সেই ছাতাঅলা লোকটির সঙ্গে কোন রেস্টুরেণ্টে হয়ত এখন বসে আছে কমলা। নির্জন একটি কোণে মুখোমুখি বসেছে দু'জনে। সামনে গরম চায়ের কাপ। দু'জনে টুকিটাকি কথা বলছে। কী কথা আর বলবে। হয়ত এই বর্ষার প্রসঙ্গই হচ্ছে, সে সঙ্গে মনের কথার দু'একটা ইসারা ইঙ্গিত, আর মুখটিপে হাসাহাসি। তারই ফাঁকে ফাঁকে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে দু'জনে।

উষার মনের চোখে এমন একটা ছবি ভেসে উঠতেই হঠাৎ যেন সে কেমন হয়ে গেল। দুঃসহ নিঃসঙ্গতা না কি দুরন্ত পিপাসা কী যে তাকে এমন চঞ্চল করল। সে পিঠের আঁচল মাথায় টেনে দিল। ভদ্রভাবে পায়ের কাপড় হাঁটুর দিকে যতটুকু তোলা যায় তুলে ধরল তারপর সেই এলোমেলো হাওয়া আর ঝরঝর জলের মধ্যে দিয়েই ছুট দিল। এক ছুটে এসে উঠল ঘড়ি-ঘরে। কিন্তু যার জন্যে এমন করে ছুটে আসা এখন কাছে এসেও তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না উষা। চায়ের জন্যে হাত বাড়াতে পারল না।

জন তিরিশ চল্লিশ লোক। সকলেই একবার তার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। এখনও কেউ কেউ চোখ ফেরায়নি। এতগুলি লোকের চোখের সামনে একটা রাস্তার চা-ফেরিঅলার থেকে এক ভাঁড় চা নিয়ে চুমুক দেবে ভাবতেই একটা বিশ্রী অনুভূতিতে সারা গা ঘিনিয়ে উঠল উষার। পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল উষা। চায়ের

ভাঁড় হাতে দিতে গিয়ে রমেশদার ঠোঁটের কোণ যদি একচুলও বেঁকে যায়, চোখ এতটুকুও তেরছা হয়, চোখের পাতা কেঁপে ওঠে এক মুহূর্তের জন্যে তাহলেও তা কী অর্থ হয়ে এতগুলি লোকের চোখে থকথকিয়ে উঠবে উষা ভাবতে পারল না। ভাববার আগেই একটা হিম অনুভূতিতে কেঁপে উঠল। সে মুখ ফেরাল। এক পা এক পা করে টেলিফোনের আলমারি-মতন ঘর দু'টোর কাছে এসে দাঁড়াল। এখানে থেকে থেকে জলের ছাঁট আসছে। এখানে কেউ তাই দাঁড়ায়নি। ঝড় জল থেকে বাঁচতে হলে এটা কোন আশ্রয় নয়। না হোক, জায়গাটা নির্জন বলে উষার খুব ভাল লাগল। আসুক জল, তবু এখানেই দাঁড়াবে সে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে নিষ্কৃতি পাবে। এখানে দাঁড়ালে তাকে চোখ দিয়ে চাটতে পারবে না কেউ।

কমলা যদি এখন কাছে-পিঠে থাকত। তাকে দেখত। এগিয়ে এসে মুখ বাঁকিয়ে বলত, 'মুখপুড়ি তুই যদি এমনি করে পালিয়েই থাকবি তবে এলি কেন?' সত্যি, লোকচক্ষুর সামনে থেকে পালাতে ত সে আসেনি, তাদের লোভে জুল্‌জুল্‌ চোখের সামনে এসে দাঁড়াবার জন্যেই ত সে ঘর ছেড়ে পথে, এখানে এসেছে। এমন সাজগোজ করেছে। হ্যাংলা পুরুষগুলি না-খাওয়া কুত্তার চোখে তাকে দেখবে, আর সে তাদের দেখাবে নিজেকে। পটের বিবির মত দাঁড়িয়ে থেকে ইসারায় ভু-ভু করে ডাকবে। অনেক ইতস্তত করবার পর কেউ সাহস করে একটু এগোবে। সেও ঘেঁষবে। ঘনিষ্ঠ হবে এক সময়ে দু'জনে। লোভে জ্বলতে থাকবে লোকটা। কোন এক নির্জন নির্দিষ্ট জায়গায় তার সঙ্গে সে-লোভের আগুনে পুড়তে যাবে সে। লোকটার কাছ থেকে তারই খেসারৎ মিলবে কিছু। তাই মাথায় ঠেকিয়ে সর্বাঙ্গে পোড়ার দাহ নিয়ে তখন বাড়িমুখো হবে। যে-লাইনের যে-রীতি সে-রীতি যদি সে না মানে তবে আসা কেন?

এ লাইনে রোজগার যদি তোমায় করতে হয় ও-রীতি যে তোমাকে মানতেই হবে।

'জান রমেশদা, এই হতচ্ছাড়ির জন্যেই তোমাকে বলা আমার।' রমেশদাকে যেদিন প্রথম কমলা পাকড়াল ওদের দালালি করবার জন্যে সেদিন বলেছিল কমলা।

'আমি নিজের জন্যে ভাবি না। এ লাইনে যখন এসেছি এ লাইনের সব রস আমি শুষে নেব। তাই কোন শুলুক সন্ধান আমি শিখতে বাকি রাখিনি। কিন্তু নিজের জন্যে ওর জন্যে এক সঙ্গে করি কি করে বলত? ওকে আমি পইপই করে বোঝাই কিন্তু ওর এক কান দিয়ে ঢোকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। বলে, তুই যদি জুটিয়ে দিস দিবি, দু'টো পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরব, নয়ত এই বসলাম। তোর হোক তারপর এক সঙ্গে যাব। বাস ভাড়াটা দিস। এই স্ট্যাচুর তলায় বসে পড়ে, রমেশদা।'

সত্যি, ও কোন দিন পারবে না। কারো মুখের দিকে তাকাতেই ওর বুক দুপ্ দুপ্ করে ওঠে। শিকার ধরে এনে দিলেও সে তার দিকে তাকাতে পারে না। একটা দম দেওয়া কলের পুতুলের মত শিকারের মনের মত চলে। সে যখন ছুটি দেয় আর কোন দিকে তাকায় না। ছুটে চলে আসে বাস স্ট্যাণ্ডে। বাসে উঠে বসে। বাসে যতক্ষণ থাকে চোখ বুজে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। ভাবে, চোখ মেললেই বুঝি একবাস লোকের চোখে ধরা পড়ে যাবে। ওর চোখের দিকে তাকালেই, ওর মুখ দেখলেই সকলে যেন বুঝে যাবে ও কী করে এসেছে।

অবশ্য ধীরে ধীরে সে-ভয় সে-লজ্জা সংকোচ ঊষার কেটে গেছে। শিকারের কাছে এখন সে সহজ হতে পারছে; কিন্তু আজও বেহায়া হয়ে উঠতে পারেনি। তার জন্যে অনেক শিকার ফসকে যায়। কমলা রাগ করে। রমেশদা যেদিন থেকে দালালি করতে শুরু

করেছে, সেও মাঝে মাঝে মক্কেলের অভিযোগ শোনাচ্ছে তাকে; কিন্তু ওরা যা চায় তা উষা কখনো হতে পারবে না। না।

আঃ, তার যদি ওই বিটকেল বুড়ি মা-টা না থাকত। সেই যে একদিন আছাড় খেয়ে পাছার হাড় ভেঙে শয্যা নিল আর উঠল না। আর উঠবেও না কোন দিন। কিন্তু কত দিন যে বিছানা কামড়ে পড়ে থাকবে তারও ঠিক নেই। ওই মরা মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই মরণের বাড়া লাঞ্ছনা আর কত দিন সইবে উষা ভেবে পায় না। না। না। আর সে সইতে পারছে না। সে মরবে। সে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। গঙ্গার জলে ছাড়া আর কোথাও তার ঠাঁই নেই। কিন্তু কেন নেই? চোখ ফেটে কান্না নামে উষার। এই যে হ্যাংলা পুরুষগুলি দু'দণ্ডের সুখের জন্যে মুঠো মুঠো টাকা ওড়ায় তারা বিয়ে করতে পারে না? বিয়ে করলে কেউ না কেউ উষাকেও ত বিয়ে করত।

কমলা বলে, 'বিয়ে করলেই সংসার পাততে হবে। শুধু পাতলেই হবে না, তাকে চালাতে হবে। এ আক্রার বাজারে তা চাট্টিখানি কথা নয়। তাই সাধ আর সাধ্যকে সবাই এক করতে পারে না। তার জন্যেই এই দু'দণ্ডের ফুর্তির পথ তারা বেছে নিয়েছে। আর তাতে করেই আমরাও বেঁচে গেছি, জানিস। না হলে, দেখিস না ঘরে ঘরে, গরীবের-বউ হওয়ায় কী সুখ! জোটে ত দু'বেলা দু'গ্রাস ডাল ভাত আর কুমড়োর ঘ্যাঁট; শুধু তার জন্যেই চব্বিশ ঘণ্টা সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে আর বাচ্চা বিইয়ে কয়েক বছরে এক একজনের চেহারা যেন শ্মশানের পোড়া কাঠ। 'রক্ষে কর বাবা।' কমলা হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। 'লোকে যাই বলুক, ভাবুক, অক্ষম পুরুষের ঝ্যাঁটা লাথি খাওয়ার থেকে অনেক সুখে আছি। অন্তত হাড়ে একটু বাতাস লাগছে।'

সত্যি এ লাইনে কমলা নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে

পেরেছে। কিন্তু উষা পারবে না। সে কোন গরীবের, ভিখিরির বউ হতেও রাজি। একবেলা খাবে। না খেয়ে থাকবে। তবু এ লাইন ছাড়তে পারলে সে বাঁচে। কিন্তু তাকে কেউ বাঁচাবে না। রমেশদাও না। তার লোভ দালালির দিকে। উষার দিকে সে কোন দিন ভাল করে তাকিয়েছে বলেও মনে পড়ে না। মনে পড়ে না, কোন ছলে কোন দিন সে তার হাত ধরেছে। তাকে ছুঁয়েছে। তবে কী রমেশদাও তাকে রাস্তার শস্তা মেয়ে বলে ঘৃণা করে? হঠাৎ এই নতুন জিজ্ঞাসায় সামনে পড়ে উষা যেন অসহায় নিরবলম্ব হয়ে পড়ল। মনের অনেক নিভৃতে ওই একটি মানুষের জন্যে তার বড় প্রতীক্ষা ছিল। আজ মনে হল, সে ভুল। সে একটা মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠল উষা। নিঃসঙ্গ একটা ভয়ানক অসহায়তা একটা ভীষণ চেহারার কুৎসিত গুবরে পোকার মতন তার বুকটাকে দাঁত দিয়ে পা দিয়ে নির্মম ভাবে ছিঁড়তে লাগল, খুঁড়তে লাগল। অসহ্য দুঃখে তার দু'চোখ ভরে জল এল।

গ

আকাশটা এখনও থমথমে। বাতাসটা এখনও পড়েনি। কিন্তু বৃষ্টিটা ধরেছে। লোকজন যে.যেখানে আটকে পড়েছিল আবার ছুটতে শুরু করেছে, এই ফাঁকে যদ্দুর যাওয়া যায়। যদি বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যায় তবেই না রক্ষে!

বিক্রি-সিক্রি যা হবার এখানেই হল। আর ভরসা নেই। তার চা খাওয়ার জন্যে মেঘ মাথায় করে কে আর কোথায় অপেক্ষা করবে। চৌরঙ্গির ট্রাম বন্ধ। আলিপুর চলছে। চৌরঙ্গি হয়ত আবার

চলবে। ট্রামের আশায় লোকজন এখানে ওখানে জমবেও। কিন্তু ট্রাম ধরার চেষ্টায়, ট্রাম না পাওয়ার আশংকায়, ব্যস্ত চিন্তিত মানুষদের তখন কি আর চায়ে রুচি থাকবে! এখানে ওখানে দু'একটা হাঁক ডাক দিয়ে সেও বাড়ি ফিরবে, ভাবল রমেশ। ঝোলা কাঁধে কলসি হাতে উঠে দাঁড়াল।

বারান্দা থেকে পথে পা দেবে রমেশ, তখন দেখল। টেলিফোন-ঘরের গায়ে হেলান দিয়ে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে উষা। আকাশ দেখছে। রমেশ থমকে দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে নিকটে এসে কলসিটা মেঝেয় রাখল।

ঠক্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠল উষা। ফিরে তাকাল। নিজের অজান্তেই তার গলা থেকে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'রমেশ দা!'

বুক-হাল্‌কা-করা খুব আরামের একটা নিঃশ্বাসও বুঝি পড়ল। যেন এই মানুষটির জন্যেই নিঃসঙ্গ সময়ের বিষণ্ণ মুহূর্তগুলি সে দম বন্ধ করে গুনছিল। তার থমথমে মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ছলছলে চোখ চক্‌চক্ করতে লাগল। এতক্ষণকার নির্বাপিত আশা আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল তার বুকে। যা ভেবেছিল ভুল, একটা মিথ্যা স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল যাকে, এই আলোয় এখন তাকেই মনে হল সত্য। সত্য আর প্রত্যক্ষ। এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ পেতে উষা রমেশকে দেখতে লাগল। কঠিন কর্মঠ বছর সাতাশ-আটাশ বয়সের কালো দেহটা দেখতে দেখতে ভাবল—হোক ফেরিঅলা, তবু সে যদি তার স্বামী হয়, উষা সুখী হবে। তার সংসারের দাসী হয়ে, তার সন্তান পেটে ধরে সে ধন্য হবে।

কলসি রেখে কাঁধের ঝোলায় হাত দিয়েছে রমেশ। টিনের কৌটোয় কাঁচের শিশিতে মাটির ভাঁড়ে একটা কর্কশ এলোমেলো আওয়াজ উঠল। একটু নুয়ে সন্তর্পণে ঝোলাটাকে মেঝেয় রাখল

রমেশ। তারপর সোজা হয়ে উষার দিকে তাকাল, 'এখানে একা দাঁড়িয়ে আছ যে, কমলা কোথায়?'

এতক্ষণের যন্ত্রণার পরে এখন একটু শান্ত হয়ে একটা মধুর আমেজে তন্দ্রাগত হয়ে পড়েছিল উষার মন। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। একটা ভীষণ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল উষা। আবার যন্ত্রণায় শক্ত হয়ে উঠল। যেন সদ্য পোড়া একটা দগ্‌দগে ঘায়ে দারুণ খোঁচা খেল। সিটিয়ে উঠল উষা। ঝাঁজাল গলায় বলল— 'জানিনে।'

উষার গলার ঝাঁজে রমেশের হাসি পেল, কমলা বুঝি শিকার ধরেছে। উষা পায়নি, সেই উষার রাগ। বলল, 'এই জলের ছাটের মধ্যে একলাটি তবে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

এখানে একা দাঁড়িয়ে আছি জেনেও ত কই একবার এলে না, আসলে আমার জন্যে তোমার কোন টান নেই, স্বার্থ ছাড়া কোন কথা নেই আমার সঙ্গে তোমার, মনে মনে গর্জে উঠল উষা। রমেশের হাসি তাকে স্পর্শ করল না। সে সেই তপ্ত সুরেই শুধাল, 'কোথায় যেতাম তবে?'

'কেন এখানে কি আর লোক দাঁড়ায়নি?' সাদা গলায় বলল রমেশ।

'বটে ওই পুরুষগুলির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতাম, না?' যেন তাকে অসম্মান করেছে রমেশ এমনি গলায় বলল।

সে কি তাই বলেছে নাকি! রমেশেরও রাগ হল, 'দাঁড়াবে না তবে এসেছ কেন?' বলল সে।

'তাই বটে,' দাঁতে দাঁত ঘষল উষা, 'তোমার জন্যে যদি কিছু দালালির বন্দোবস্তই না হল তবে এলাম কেন?'

এবার আহত হল রমেশ।

'আমি দালালি চাই, আমার কথার তুমি এই মানে বুঝলে?'

ছু' পলক নিঃশব্দ থেকে থমথমে গলায় বলল, 'কমলা আমাকে ক'টা দালালি দেয়, সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেয়। তবু ত আমি তার খোঁজ-খবর করি, এইমাত্রও ত তোমাকে তার কথা জিজ্ঞেস করলাম।'

রমেশের কথায় উষা এতটুকু শান্ত হল না, বরং তার স্বর আরও কঠিন আরও রূঢ় হল।

'করবেই ত, কেন করবে সেকি আমি জানিনে?'

বিস্মিত হল রমেশ। ভ্রূ-কুঁচকোল।

'কী জান তুমি?'

জিজ্ঞেস করে উষার মুখের দিকে তাকাল সে।

উষা মুখ ফিরিয়ে ছিল। তার মুখ দেখতে পেল না রমেশ। তার গালের খানিকটা, কান, কানের সোনার পেন্‌ডেণ্ট, জুলপির কয়েকগাছি চুল, মস্ত একটা খোঁপা, সরু গ্রীবা দেখতে দেখতে ভাবল: ওর মেজাজ আজ এমন তিরিক্ষি কেন? ওর মায়ের কি অসুখটা বেড়েছে? ওর হাতে কি টাকা-কড়ি নেই? ভাবতে ভাবতে ওকে আরো কয়েক-মুহূর্ত দেখল। দেখল আর দুঃখ বোধ করতে থাকল। ওর মনের বিস্ময় আর বিরক্তি মুছে গেল। স্নেহার্দ্র হয়ে উঠল সে।

রমেশ তার চায়ের কলসির কাছে বসে পড়ল। বলল, 'বস, চা খাও।' অন্য মানুষের মতন গলা শুনল উষা। সে ঘাড় ফিরাল। 'যা ভিজেছ, এক্ষুনি ঠাণ্ডা লাগবে।'

কান পেতে সবক'টি কথা শুনল উষা। রমেশের উস্কখুস্ক একমাথা চুলের মধ্যে দৃষ্টি ডুবিয়ে ভাবল: এ কি ওর মনের কথা, না, মন-রাখা কথা। তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে দালালি জোগাড়ের চেষ্টা না ত। সন্দিগ্ধ চোখে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'কই, বস।' বলে তখনই রমেশ ওর দিকে চোখ তুলেছে।

কুঁচকোন কপালের নিচে ওর প্রখর চোখ দেখে চমকে উঠল, কি হয়েছে ওর? আবার ভাবল সে। এমন গুরুতর কি ঘটল? কমলার কথা মনে পড়ল। উষা বলবে না। কমলা থাকলে জানা যেত। কোন দুঃখ পেয়েছে নাকি, কে জানে কেউ অপমান করেছে এমনও হতে পারে। উষার খুব আত্মসম্মান বোধ।

'বস না, উনুনটার কাছে একটু।' বসলে সে খুব খুশি হবে এ রকম গলায় অনুরোধ করল। 'বসে গা-টা গরম কর।'

রমেশকে দেখতে দেখতে, তার খুব আপনজনের মতন আদুরে কথা শুনতে শুনতে অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল উষা। ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবল, এসব ভণ্ডামি। আদৌ অন্তরের কথা নয়।

'আমি বসব না।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল উষা।

থাকগে না বসুক। রমেশ আর পীড়াপীড়ি করল না। সে ঝোলা থেকে একটা ভাঁড় তুলে নিল।

'আমি চা খাব না।' উষা রমেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল। গম্ভীর থমথমে গলা উষার।

কলসির নলের তলায় এসে রমেশের হাত থেমে গেল। সে চোখ তুলল, 'কি, বর্ষায় এমন ভিজলে, এক ভাঁড় আদা-চাও খাবে না?'

'না। আমার পয়সা নেই।'

উষা মুখ ফিরিয়ে নিল।

একটা সুযোগ পেয়েছে, পরিবেশটা হাল্‌কা করবার জন্যে একটু শব্দ করেই হেসে উঠল রমেশ।

'খাও, তোমার কাছ থেকে পয়সা নেব না।' হাসতে হাসতেই বলল সে।

'কেন পয়সা নেবে না?' ঘাড় বাঁকা করে উঠল উষা, হিম গলায় বলল, 'কেন বিনি পয়সায় খাওয়াবে, আমি কি তোমার রাঁড় না মাগ?'

এতক্ষণে স্বস্তি পেল উষা। তার মনটা হাল্‌কা হল। রমেশদা এর জবাব কী দেয় শুনবে উষা। রমেশদাকে পরখ করবার সুযোগ হয়েছে! উৎকর্ণ হল সে।

বরফ-ঠাণ্ডা এ প্রশ্নের মধ্যেও কত যেন হাসির বস্তু, এমনি শব্দ করে হেসে উঠল রমেশ। কিন্তু তখনই থেমে শান্ত গলায় বলল, 'তুমি আমার রাঁড়ও নও, মাগও নও।'

সে চা ঢালল, তাতে আদা দিল এবং ভাঁড়টা উঁচু করে ধরে বলল, 'নাও।'

'আমি তোমার কী তবে?' ভাঁড়টা না ধরেই প্রশ্ন করল উষা।

'ধর না, বলছি।'

একটু হেসে ধমকে উঠল রমেশ।

উষা তখন ভাঁড়টা নিল। বলল, 'নিলাম, কিন্তু না বললে চা মুখে দেব না। বল, আমি তোমার কে?'

ধীরে সুস্থে রমেশ নিজেও এক ভাঁড় চা নিল। চা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উষার দিকে তাকাল। তখন তার ঠোঁটে হাসির মৃদু সুন্দর একটি ঢেউ। ঠোঁটের সে ঢেউ একটু পরে গাল পেরিয়ে চোখে এসে কাঁপতে থাকল তিরতির করে।

আশায় উৎকণ্ঠায় উষা শুধোল, 'কই, বল?'

হাতের ভাঁড়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে রমেশ বলল, 'তুমি আমার বোন।'

কথাটা কানের ভিতর দিয়ে মগজে পৌঁছোতে একটু সময় লাগল, মানে বুঝতে আরও একটু সময়। তারপরেই মনে হল রমেশদা তার সারা গায়ে বিছুটি ছড়িয়ে দিয়েছে, সর্বাঙ্গে এমনি জ্বলে উঠল উষা। যে-কথাটা রমেশদার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিল নিজের বুকের মধ্যে কান পেতে সেই কথাটা নিজের মনেই উচ্চারণ করল সে। রমেশদার উচ্চারিত কথাটার সঙ্গে তুলনা করল। তার

সেই কথাটার থেকে এ কথাটা কত তুচ্ছ, কত ছোট। আসলে সে রমেশদার কাছে ছোটই।

রমেশদা তাকে অত্যন্ত ছোটই মনে করে। রাস্তার একটা শস্তা মেয়ে মানুষ। ভিখিরিরও বাড়া। সে তার কেউ নয়। ভালবাসার পাত্রী ত নয়-ই। সে শুধু অনুকম্পার পাত্রী। অনুগ্রহের পাত্রী আর সে কথাটা বোঝাতেই ওই মোলায়েম শব্দটাকে সুন্দর একটি হাসির মোড়ক দিয়ে তাকে উপহার দিয়েছে রমেশদা। ভীষণ একটা ধাক্কা খেল উষা। তার সমস্ত শরীর প্রচণ্ড একটা দোলায় টালমাটাল হয়ে উঠল। তার অবচেতন মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রমেশদা তাকে ভালবাসে। তার চেতন মনে একটা বড় আশা ছিল রমেশদাকে সে পাবে। পায়ের তলাকার মাটির মত সে বিশ্বাস কেঁপে উঠল। মাথার ওপরকার ছাদের মত সে আশা ভেঙে পড়ল। একটা সর্বগ্রাসী রিক্ততার মর্মান্তিক অনুভূতিতে আতংকিত উষা ভয়ানক শিউরে উঠল। চায়ের ভাঁড়টা ঠক্ করে পড়ে গেল উষার হাত থেকে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে চা ছড়িয়ে পড়ল। ভাঁড়টা ভেঙে টুকরোগুলি এদিকে ওদিকে ছিটকে গেল।

রমেশ হকচকিয়ে উঠল। বিস্ময়ের আর আশংকার অবধি রইল না তার। সে চুপ-চোখে তাকিয়ে থাকল উষার দিকে। এত কাঁপছে কেন উষা? এমন ত কোন দিন দেখিনি তার। আজ তার কী হয়েছে!

আর ধৈর্য ধরতে না পেরে শুধোল, 'কী, হয়েছে কী তোমার, এমন করছ কেন?'

একটা অসহ্য উত্তেজনায় উষার ঠোঁট গাল বেঁকেচুরে কেঁপে ক্রমাগত লাল নীল সাদা হয়ে ক্ষণে ক্ষণে রূপ আর রঙ পালটাচ্ছিল। অনেকক্ষণে নিজেকে একটু সংযত করে উষা বলল, 'রমেশদা, তুমি ছোট, ভীষণ ছোট। তোমার মত ছোটলোক আর আমি দেখিনি।'

'কেন, কী করলাম আমি?' বেদনায় বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকোল রমেশ, 'তোমায় বোন বলে কী অপরাধ আমি করেছি, তোমাকে আমি বোনের মত দেখতে পারিনে?'

'না না না।'

প্রচণ্ড উত্তাপে ফেটে পড়ল উষা।

এবার রমেশের রাগ হল।

'আমাকে তুমি রমেশদা বলে ডাক কেন তবে? আমাকে দাদার মতন দেখ না তুমি?'

'জানি, সেই সুবাদেই আমাকে তুমি বোন বলেছ।' ফণা তোলা সাপের মতন ফুঁসে উঠল উষা, 'নইলে আমি তোমার কেউ না। তুমি আমাকে এতটুকু ভালবাস না। তুমি যে কাকে ভালবাস তাও আমার জানতে বাকি নেই।'

সব তাপ উজাড় করে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত নিভে গেল উষা।

সে ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা তুলো নরম মাণিব্যাগ বের করল। থরথর করে তার হাত কাঁপছিল। সেই কাঁপা হাতে ব্যাগের চেন খুলে দু আঙুলে যে-ক'টা খুচরো পেল রমেশের ঝোলার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও তোমার চায়ের দাম।'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে।

রমেশ একটা হাবা বোকা মানুষের মত অবাক-চোখে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ বেকুফ হয়ে রইল রমেশ।

তিন

বিদ্যুতের তাজা তার ছুঁলে কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ যেমন হয়ে যায়, না-মরেও মরার মতন—নির্বোধ বিমূঢ়, সেও তেমনি হয়েছিল। ধীরে ধীরে সে ঘোর এখন কেটে এল তার। আছাড় খাওয়া মাটির ভাঁড়ের মত ভেঙ্গেচুরে যাওয়া বুদ্ধিটা আবার জোড়া লাগতে লাগল। উষার ছবিটা তার মনে পড়ল—তার নাক চোখ জুলপির কয়েকগাছি দিঘল খাপছাড়া চুল কানের পেন্‌ডেণ্ট মস্ত খোঁপা গ্রীবার খানিকটা কণ্ঠার হাড় সেখানে ব্লাউজের রেশমী কাজ। রাগ করে উষা যখন তাকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছে সে-সময়কার ছবি, অথবা একটু আগেকার।

উষা তাকে চায়ের দাম দিয়েছিল। রমেশ হাতড়ে হাতড়ে পয়সা খুঁজতে লাগল। ঝোলার ওপরে ঝোলার পাশে নিচে খুঁজে খুঁজে পেল দুটো দশ একটা পাঁচ একটা সিকি। হাতের চেটোয় রেখে সেগুলি দেখতে লাগল রমেশ। উষার হাড়-ভাঙা রোজগার। উষা। উষার ছবি। চোখ। হাতের চেটোর খুচরোগুলিই যেন উষার উজ্জ্বল চোখ হয়ে চেয়ে আছে রমেশের দিকে। কেমন যেন চমকে উঠল রমেশ।

তখন ওই রকম প্রখর দৃষ্টি পেতে উষা তাকে দেখছিল কেন? কী দেখছিল সে! অথবা কিছু দেখছিল না। কথাটা বলবার আগে শব্দগুলি সাজাচ্ছিল মনের মধ্যে। নাকি কথাটা তখনই

শব্দের ভারি কঠিন একটা ডেলা হয়ে তার বুকের মধ্যে ভীষণ পাক খাচ্ছিল তাই ওই রকম চোখ ওই চেহারা হয়েছিল উষার। ঘাড়টা কাত হয়েছিল। নাকটা ফুলছিল বার বার।

অবাক হয়ে যায় রমেশ। সত্যি এখন তার বড় আশ্চর্য লাগে : 'তুমি আমাকে এতটুকু ভালবাস না। তুমি যে কাকে ভালবাস তাও আমি জানি।' এ আবার কেমন অভিযোগ উষার। সে আবার কাকে ভালবাসে। উষা জানে এমন কাকে রমেশ ভালবাসল। উষা রমেশের কতটুকু জানে? উষার সঙ্গে তার এইখানে এই গুমটিতে ওই পার্কে যতটুকু পরিচয়। উষার সঙ্গে আর কমলার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে তার যেটুকু সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা তা এখানেই। এখানকার বাইরে উষার সঙ্গে কমলার সঙ্গে তার কোনদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। হয় না। তবে কাকে রমেশ ভালবাসে বলে এমন নিঃসন্দেহ উষা। রমেশের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা উষার জানা তেমন একটি মেয়েই ত আছে জানে রমেশ। তবে কি সেই কমলাকে নিয়েই উষার এই অভিযোগ। এত রাগ। কিন্তু উষা কি জানে না, কমলার মত মেয়ের কাছে রমেশের মত একটা চা-ফেরিঅলার ভালবাসার এক ফোঁটা দাম নেই। কিন্তু দাম তার কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, কমলা তার সামান্য মূল্যও না দিক, তবু ত রমেশ তাকে ভালবাসতে পারে। ভালবাসা এক দিককারও ত হয়। এক পেশে। উষার বুঝি সে-ই সন্দেহ। রমেশের হাবভাবে, ব্যবহারে উষা হয় ত তেমনই সন্দেহের কিছু দেখে থাকবে কোনদিন। অন্তত প্রথম দিকে তেমন কিছু দেখা অসম্ভব ছিল না।

রমেশ মনে মনে স্বীকার করে। প্রথম প্রথম কমলার জন্যে রমেশের মধ্যে লোভ ছিল।

রমেশের বিশ্বাস কমলাকে সব পুরুষেরই ভাল লাগে। কমলার জন্যে সব পুরুষেরই লোভ হয়। মানুষের মনে নেশা ধরাতে জানে

কমলা। ওর হাসিতে আছে সেই নেশা। হাসলে ওর গালে গর্ত গর্ত টোল পড়ে। সে গর্তে একবার চোখ পড়লে দৃষ্টি আছাড় খায়, আর উঠতে পারে না। ওর নেশা ধরান সে হাসি ঢেউ হয়ে হয়ে চোখ দুটোতে এসে যখন কাঁপতে থাকে তখন সে চোখে সাপের যাদু খেলে। কি এক টানে দূরের মানুষ কাছে আসে। কাছের মানুষ ভেঙে পড়ে। ওর সর্বাঙ্গেও সেই হাসির ঢল। ও সর্বদাই যেন কি এক খুশিতে চঞ্চল। ওর সে খুশির চাঞ্চল্যও কম টানে না মানুষকে।

এক মুহূর্ত সুস্থ সুস্থির হয়ে বসতে পারে না মেয়েটা। রমেশ চেয়ে চেয়ে দেখে ওর কাণ্ড। ওর কাণ্ড দেখে আশেপাশের সকলেই ওর দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। তাইতেই বুঝি ও এত সহজে শিকার পায়।

ওরা যখন পার্কটায় আসে, আলো-ছায়া-আবছা পার্কের ঘাসের ওপরে বসে কখনো। কখনো বসে স্ট্যাচুটার নিচে সিঁড়ির ওপর। উষা বসে থাকে নিশ্চল, আর একটা পাথরের মূর্তি যেন। উষা আদৌ কথা বলে না। কিংবা কদাচিৎ কথা বলে। তাও কমলার মতন না। তার মতন কানের খুব কাছে ঠোঁট এনে নয় অথবা চেঁচিয়েও না। উষা নিরুত্তাপ গলায় নিচু স্বরে কথা বলে। উত্তেজনার কথাতেও বুঝি উত্তাপ থাকে না ওর গলায়।

…কতদিনের কত ছবি মনে পড়ে রমেশের। একদিন ট্রাম লাইন পার হয়ে লোহার বেড়া টপকে সোজা এসে ঢুকেছে পার্কে। সবে একটা হাঁক দিয়েছে—'চাই গরম চা', অমনি একটা মস্ত পাখি যেন মাটির ওপর দিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তার সামনে ঝুপ করে এসে বসে পড়ল। চমকে উঠে রমেশ দেখল, না, পাখি নয়। আঁচল উড়িয়ে কমলা এসে ঝুপ করে বসে পড়েছে।

'রমেশদা, চা দাও, চা। এতক্ষণ কোথায় ছিলে, তোমার পথ চেয়ে চেয়ে গলা শুকিয়ে যে কাঠ হয়ে আছে রমেশদা।'

রমেশ চা ঢালবার জন্যে বসতে যাবে কমলা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খিল খিল হেসে বলল, 'না না, এখানে নয় আর একটু এগিয়ে বসবে, এস।'

রমেশকে কমলা টেনে নিয়ে এল উষার কাছে। বলে উঠল, 'এই ছাখ উষী, তোর চা-অলাকে ধরে এনেছি, নে এবার শুকনো গলা ভেজা। জান রমেশদা, তোমার চা নইলে উষীর গলা ভেজে না, গাল ওঠে না।'

'বারে, সে কথা আমি বলেছি নাকি।' উষা প্রতিবাদ করে ওঠে।

কমলা বলে ওঠে, 'বলিসনি, কিন্তু বলতে কিছু বাকিও রাখিসনি। আমি এসে অব্দি তিন ভাঁড় চা খেলাম, প্রত্যেক বার তোকে সেধেছি, তুই কেবল বলেছিস, আমি খাব না, আমার খেতে ইচ্ছে নেই। কিন্তু যেই রমেশদাকে দেখেছিস, রমেশদাকে দেখবার বা তার হাঁক শুনবার জন্যেই যেন চোখ কান খাড়া করে ছিলিস, বলে উঠলি, ওই দেখ রমেশদা আসছে, অর্থাৎ এবার তোর চায়ের পিপাসা পেয়েছে।'

'বারে আমি কি চা খাওয়ার জন্যে বলেছি নাকি?'

'তবে কিসের জন্যে! ও—ও! তাই বল।'

চোখের তির্যক সংকেতে গলার হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরে সর্বাঙ্গের এক আন্দোলিত ভঙ্গীতে কমলা একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট করে তোলে, তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বলে, 'রমেশদা শিগগির একটি পাত্র দেখ।' বলেই হাসতে হাসতে রমেশের হাঁটুর ওপরে গড়িয়ে পড়ে কমলা।

রমেশ তখন হাসে। হাসতে হাসতে উষার দিকে তাকায়। উষা কিন্তু তখন ভীষণ গম্ভীর। রাগ করে সে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। উষা এমন হাসির কথাতেও হাসে না দেখে রমেশের রাগ হয়। আবার নিজের হাঁটুর ওপরে কমলার দেহের উষ্ণ স্পর্শে একটা খুশির বন্যায় থইথই করতে থাকে তার সারা শরীর।

যেদিন কমলা কোন উৎসুক মানুষকে দেখিয়ে কানে কানে

তাকে নিমন্ত্রণ জানানোর কথা বলে সেদিন রমেশের স্নায়ু যেন আরো টানটান হয়। ছিঁড়ে যেতে চায়। কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে আসে কমলা। ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা যখন বলে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে কানের পর্দায়, কানের পিঠে ঠোঁটের ছোঁয়া লাগে বার বার। কমলার নাকের মুখের গরম নিঃশ্বাস এসে লাগে তার গালে গলায়। কমলার কপালের উড়ন্ত চুল ওর নাকে মুখে আঙুল বুলোয়। তখন সর্বাঙ্গ শিরশির্‌ করতে থাকে রমেশের। তার সমস্ত বোধ-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। কী বলে কমলা কিছুই শুনতে পায় না রমেশ। একটা প্রবল উত্তেজনায় তার নাভি কাঁপতে থাকে। এসব সময়ে কখনো কখনো রমেশের ইচ্ছে হত, দারুণ ইচ্ছে হত ওকে জড়িয়ে ধরে। তখনই ধরে। অথবা কোন নির্জনে তখনই ওকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সে ইচ্ছের প্রশ্রয় কখনো সে পায়নি কমলার কাছে।

কমলা তার দেহে মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সে আগুন নিজের হাতে নিবিয়েও দিয়েছিল কমলাই। সে ... বিনামূল্যে কারো ইচ্ছে পূরণ করে না, কথায় কথায় সে ক...
কমলা। সে যে রমেশকে উদ্দেশ করেই ...
নয়। সব্বাইকার সম্পর্কেই তার ওই এক ...
করবার জন্যে এ পথে এসেছি, টাক...
বল রমেশদা, ময়রার মিঠাইকে ...
তোমাকে কখনো তাই ...
না।

কানে কথা বলার সময় গালের ওপরে তার উষ্ণ নিশ্বাস উত্তেজিত করে না তাকে। সে বুঝেছে, কমলা তাকে যতই উত্তেজিত করুক উত্তেজনার শান্তি সে কখনো তাকে দেবে না। ট্যাঁকে টাকা না থাকলে তার কাছে কারো স্থান নেই। তার মত নোংরা চা-অলার ট্যাঁকে টাকা থাকলেও হয়ত তার কাছে জায়গা হবে না। এইটে সে ভাল করে বুঝেছিল বলেই খুব তাড়াতাড়ি তার মোহ ভঙ্গ হয়েছে।

উষা আবার কমলার উল্টো। সে পয়সা চাইতে জানে না। পয়সা কামাতেও না। তার ভরসা তার রমেশদা। রমেশদা জুটিয়ে এনে দিলে ফাঁসির আসামীর মত সে তার সঙ্গে যাবে, অর্থের বিনিময়ে খদ্দের যা চাইবে রবারের পুতুলের মতন থেকে তাই দেবে সে তাকে। তারপব মুক্তি পেলে তাড়া-খাওয়া কুকুরের ম[illegible] ছুটবে সোজা বাড়ি। একটি খদ্দের বিদেয় করবার পরে লাস্ট বাসের জন্যে হাতে দু' তিন ঘণ্টা সময় থাকলেও দ্বিতীয় খদ্দের ধরবে না

অপেক্ষায় যদি কখনো পার্কে এসে বসে, মাথা নিচু

থাকে। রমেশ সে সময়ে তার কাছে গেলেও

[illegible]র অভিযোগ যদি কিছু বলে রমেশ, সেই

। বেশি বললে রেগে যাবে। বলবে,

[illegible]দা, তুমি যাও।' অথবা কাঁদ[illegible]।

[illegible] শুধু তখন। কোন শব্দ

গল্পগ্রহ। ওর জন্যে খদ্দের এনে দেবে। খদ্দেরের থেকে দাম আদায় করে দেবে। আরে, তুই নিজে যদি কিছুই না পারবি তবে এ লাইনে এলি কেন! এ লাইন যার সয় না এ লাইন থেকে তার সরে পড়াই ত উচিত। কিন্তু সে বিরক্তি ছাপিয়ে তখনই আবার করুণা জাগে, মমতা হয়। দুঃখিত মনে ভাবে যার ঘরে খাবার নেই, খাবার জুটিয়ে এনে দেবার নেই সোমত্ত সেই মেয়ের এ পথ ছাড়া গতি কি। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এ পথেই যে তাকে পা বাড়াতে হবে।

কমলা উষার ওই ভাব-ভঙ্গীকে বলে ঢঙ্, বলে ন্যাকামো। নাক সিঁটকে আরো অনেক বলে। কমলার সে সব নেই। দিল খোলা হাসি হেসে রমেশের সঙ্গে সে তার খদ্দের জুটানোর গল্প করে, কেমন করে তাদের ঘাড় মটকায়, পকেট ফাঁক করে। খদ্দের নিয়ে চুটকি রসালাপও করে সে রমেশের সঙ্গে। কিন্তু একেবারে ফালতু করে না। নতুন করে চা দিয়ে কড়া করে বড় এক ভাঁড় চা বিনি পয়সায় খায়। খেতে খেতে ওই সব চুটকি গল্প উপহার দেয়। কখনো তার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলে—'রমেশদা এর জন্যে আর একদিনের আর এক ভাঁড় চা পাওনা হল কিন্তু।' বলে বাঁকা চোখে চেয়ে খিলখিল করে হাসে।

তার গল্পে তার কথার ভঙ্গীতে ব্যবহারে কখনো কখনো রমেশ নিজের অজ্ঞাতেই উত্তেজিত হয়ে উঠত, একটা অভুক্ত জীবনের জ্বালা তার চোখের তারায় তার মুখের রেখায় তখন বুঝি দেখতে পেত কমলা। একদিন বুঝি তাই দেখেই শুধিয়েছিল কমলা, 'আচ্ছা রমেশদা, তুমি ত বলেছ তুমি নাকি বিয়ে করনি, তবে এই বয়স নিয়ে একা থাক কি করে? রাতে ঘুম আসে?

রমেশ হেসে বলেছিল, 'ঘুম আর আসে কই! দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকি কোন মতে।'

কমলা হেসে বলেছিল, ‘এত কষ্ট পাও কেন? যা রোজগার কর তার কিছু খরচ করে দেহটা ঠাণ্ডা করতে পার না? শস্তার মেয়েমানুষও ত আছে।’

‘তা আছে,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমেশ বলেছিল, ‘কিন্তু গরীবের কী ঘোড়া রোগ হলে রক্ষে আছে।’

কমলা বলেছিল, ‘তা ঠিক যদি দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে পার ভালই। কিছু কিছু করে জমিয়ে একদিন বিয়ে করে সংসার পাতবে। তোমাদের শিয়ালদার স্টেশনে ত অনেক উদ্বাস্তু মেয়ে আছে। রান্না করতে পারে, ঘর গুছাতে পারে, এমন শান্ত শিষ্ট একটি দেখে বিয়ে করে ফেলো। কিন্তু সেদিন যেন তোমার এই কমলিকে ভুল না। গিয়ে যদি উঠি একটু বসতে দিও। এক ভাঁড় চা দিও।’ মুখ টিপে হেসে উঠেছিল কমলা।

রমেশ বলেছিল, ‘দেব। বসতে দেব। চা খাওয়াব। দুদিন যদি থাক যত্ন করে রাখব। কিন্তু আমার কী সে ভাগ্য হবে? আমার মত চা-অলার কাছে কে বিয়ে বসতে চাইবে!’

‘ইস্ চাইবে না আবার,’ রমেশের হাতের গুলী টিপে ধরে বলে উঠেছিল, ‘এমন শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলের বউ হতে কে চাইবে না! তোমার বউ হতে আমারই ত লোভ হয় রমেশদা, কিন্তু আমার মত মেয়েকে তুমি বউ করবে কেন? সংসারে সীতা সাবিত্রীর ত অভাব নেই। যদ্দিন তাদের কাউকে না পাচ্ছ তাদের স্বপ্ন দেখে রাত কাটাও রমেশদা।’

রমেশের মাথার চুল পাঁচ আঙুলে এলোমেলো করে দিয়ে কমলা আঁচল উড়িয়ে চলে গেছে।

রমেশ বসে রয়েছে একা একা। ভেবেছে।

দীর্ঘদিনের ইতিহাস তাকে হানা দিয়ে গেছে তখন।

খ

স্বপ্ন দেখবে না রমেশ। মেয়েদের আবার স্বপ্নে দেখতে হয় নাকি। এখানে তাদের স্বপ্নে দেখার দরকার কী। চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকলেই ত দেখা যায়। কলকাতার সমস্ত পথ বেয়ে দিন রাত তাদের আসা যাওয়া। ধনীর রূপসী তরুণীদের দেখতে চাও, তাও। মেছুনী ঘুঁটে-কুড়োনী, তাও। চিনতে পারলে সীতা সাবিত্রীদেরও দেখতে পাবে।

কলেজ সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াও দেখতে পাবে তোমার স্বপ্নলোকের পরীদের। পরী না বুঝি রঙিন প্রজাপতি। কলেজ সিনেমার বন্ধ দরজাগুলি যখন খুলে যাবে আর বেরিয়ে আসতে থাকবে তারা, মনে হবে, হ্যাঁ, প্রজাপতিই, গুটি-ঘর কেটে বেরিয়ে এইমাত্র নগর-আলোয় পাখা মেলে দিয়েছে। তাদের সেই উড়ন্ত রঙিন দেহের আন্দোলিত গতির ঢেউ তোমার বুকেও এসে আছড়ে পড়বে। মনে হবে তুমি স্বপ্ন দেখছ। ভুলে যাবে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথ, ফুটপাথ। ভাববে তুমি পথ হারিয়ে কোন্‌খানে এসেছ! প্রজাপতি ধরতেই এসেছ। প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতেই বুঝি এসেছ। তুমি প্রজাপতির পেছনে ছুটবে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে বেকুব হবে। স্বপ্ন ভেঙে যাবে। বুকের মধ্যে একটা ভীষণ যন্ত্রণা হবে। সমস্ত শরীর নিংড়ে একটা দুরন্ত উত্তেজনা মুক্তির জন্যে বুকের রক্তে ছটফট করবে।

মেছুনী ঘুঁটে কুড়োনী দেখে তেমন হবে না। আস্তাকুঁড়ের মাছিকে কোন্ বোকা মৌমাছি ভাববে। সীতা সাবিত্রীদের চেনা যাবে না তাই তাদের নিয়ে কারো মানসিক দ্বন্দ্ব নেই। তবে হ্যাঁ, আর এক জাতের মেয়ে আছে, বিকেলের-পিতল-রোদে প্রজাপতি

হতে গিয়ে যারা রঙিন সাইনবোর্ড হয়ে যায়। আলো-ছায়ার ধারে ধারে তাদের ইশারা ঝুলতে থাকে। কিন্তু রুপোর চাঁদের আলো নইলে তাদের মুখ দেখা যায় না। সে মুখ বাঁকাচোরা রেখা-রেখা অন্ধকারে অচেনা থাকে।

রমেশ এদের কাউকেই তাই স্বপ্ন দেখে না। স্বপ্ন দেখে মানুষ তারই, যাকে পাওয়া যেতে পারত কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না; যাকে পেলে বুক ভরত, না পেয়ে বুক শূন্য। স্বপ্ন সেই শূন্য পূর্ণ করে, কখনো আলেয়ার মত জ্বলে নিভে মিলিয়ে যায়; কখনো রামধনুর সিঁড়ি পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে সিঁড়ি বাইতে বাইতে আর শেষ হয় না। শেষে দারুণ পিপাসায় স্বপ্ন বিফল হয়ে যায়। এ সব তাই দুঃখ মনে হয় রমেশের কাছে। অনেক দুঃখে পোড়া মানুষ রমেশ। এই নতুন তৈরি দুঃখ তাই বইতে চায় না। সে স্বপ্ন দেখতে চায় না। স্বপ্ন সে দেখে না। স্বপ্নে তার লোভ নেই।

তাই অন্য জাত ছেড়ে সে স্বজাতের মেয়েদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। স্বজাত মানে উদ্বাস্তু বলে যে জাতটা শিয়ালদা স্টেশনের ডাস্টবিনগুলির আশেপাশে নতুন ডাস্টবিনের মত জমে উঠেছে। সে নতুন ডাস্টবিনে অনেক বেওয়ারিস ভাল জিনিস অনেক জঞ্জালের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। জঞ্জাল ঘেঁটে তাই হাতিয়ে নিতে আসে অনেক লোক। রমেশ এবং তার মত আরও কেউ কেউ তা পছন্দ করত না। এ ত তাদেরই জিনিস। তাদের ঘর নেই রাখবার জায়গা নেই বলে জঞ্জালের মধ্যে গড়াচ্ছে।

রমেশ বলত, চেঁচিয়ে উঠত, 'কুত্তা আইছেরে, লাঠি লইয়া আয়।'

প্রথম প্রথম সহ্য করেছে মা বাপ ভাইরা।

প্রতিবাদ করতে লজ্জা করত, ভয়-ভয় করত। কি জানি থানা পুলিশ করলে ল্যাঠা। ডোল বন্ধ হতে পারে, ঋণ পাওয়া, পুনর্বাসন পাওয়া বন্ধ হতে পারে। কিন্তু সে সব সম্ভাবনা, আশা যখন

অনাহারের সামনে শুকিয়ে স্বপ্ন হয়ে ওঠে তখন তাদের মেজাজ চড়ে। বিগড়য়।

রমেশদের ওপরে ক্ষেপে ওঠে তারা। সেই যে পেত্নীর মত মেয়েমানুষটা, চামড়ায় ঢাকা কংকাল একটা, সারাদিন রাস্তার একধারে হাত পেতে চুপ করে বসে থাকে, রাত দুপুরে একদিন তারই কি গাল, কি মুখ-খিঁচুনি শুনল রমেশ।

সব চুপ চাপ। ঘুমন্ত। ঘুমন্ত না ঠিক। পেট ভরা থাকলে ত চোখে ঘুম আসবে। পেটে যদি সর্বক্ষণ ক্ষুধা রাক্ষুসী কেবলই মাংস খোঁড়ে তবে মানুষ ঘুমোবে কী করে। ঘুমোয় না। ঘুম আসে না। তবে সারাদিন পেটের ধান্ধায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত দেহটা রাত দুপুরে নির্জীব হয়ে যায়। মরন্ত হয়ে থাকে। নিঃঝুম নিঃসাড় তাই মনে হয় চারধার।

এমন সময় সাবি চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'মা মা দেখ রমেশদা আমার হাত ধরেছে।'

একটা কালো দুর্গন্ধ ছেঁড়া কাঁথা সরে গিয়েছিল, তার তলা থেকে—যেন নোংরা খানিকটা মাটি সরে গিয়েছিল—তার তলা থেকে, কবর থেকে উঠে বসেছিল একটা বীভৎস কংকাল। কথা বলে উঠেছিল।

'রমেশ্যা তুই অরে ধরছস ক্যান ?'

'সাবি যাইতে আছে কই, তুমি জান ?'

'যেখানে খুশি যাউক তর কী ? তুই অরে খাইতে দিবি, তুই যে অরে ধরছস ?'

'ইস খেতে দিলেই আমি ওর বান্দিগিরী করব কিনা। মুটে মজুরের আবার বউয়ের সখ ! ছাড় হাত।'

হাত ছাড়াতে হয়নি সাবির। সাবির কথার চাবুক খেয়েই আলগা হয়ে গিয়েছিল রমেশের হাত।

মা যে-পথ খুলে দিয়েছে, সে, অনাত্মীয় সে, সে-পথ রুখবে কী করে। রমেশের মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটেছিল। তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। মরা আলোর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে অনেক দূরে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল সাবি। সেই ছায়া-হয়ে-যাওয়া সাবিত্রীর ছবি দেখতে দেখতে রমেশ সার ভেবেছিল সেদিন ঃ এদের রোখা যায় না। রোখা যাবে না। এই বাঘিনীরা রক্তের স্বাদ পেয়েছে। সে তবু যে কেন বৃথা চেষ্টা করে। বুঝি তার কেউ নেই বলে করে। বুঝি তার কেউ নেই বলে ধর্ম বোধটা এমন আঁকড়ে আছে তাকে। তার যদি কেউ থাকত—বোন, বউদি, বউ, তবে সে কি করত? তাদের খাওয়াতে না পারলে সে কি এই পথই দেখিয়ে দিত না? পথ দেখিয়ে দিত। হয়ত নিজে গিয়ে পথ থেকে নিত্য নতুন লোক এনে দিত তাদের কাছে। হরেন দিচ্ছে তার বোনকে এনে। হরলাল দিচ্ছে তার বউকে। আর বিহারীদা ত তার মেয়েকে নিয়ে নিজেই পথে নেমেছে।

সেই রাতের মার্কাস স্কোয়ারের দৃশ্যটা ভেসে উঠল তার চোখে। মিনির বয়স আর কত। চোদ্দ হবে, খুব জোর পনর। তার ওপরে ওইত লিকলিকে চেহারা। ফ্রক পরলে মনে হয় বয়স বুঝি বছর বার।

বিহারীদাই নিজে এসে বলল। রমেশ বসে বসে বিড়ি টানছিল, রাত তখন গোটা নয়।

'রমেশ বেকার বইস্যা আছ যাইবা নাকি আমার সঙ্গে। একটা লোকের একটা ভাঙা আলমারি সারাই কইরা দিছিলাম। টাকা ত ব্যাটার থনে কিছুতেই আদায় করতে পারতে আছি না। যাইবা?'

বিহারীদার কিছু মরচে পড়া যন্ত্রপাতি একটা থলের মধ্যে আছে জানত রমেশ। মাঝে মাঝে তা নিয়ে বেরয়ও দেখে সে। ভাবল সত্যি বুঝি। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল।'

মিনিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। রমেশ শুধাল, 'ও আবার কেন?'

বিহারীদা বলল, 'আসুক না, বেশি দূরে যামু না ত, এই ত কাছেই।'

বেশ আসুক। রমেশ আর কিছু বলল না। স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকল বিহারীদা।

রমেশ তখন দেখে, মিনি নেই। কই গেল মিনি জানতে চাইল রমেশ।

নির্বিকার গলা বিহারীদার, বলল, 'আছেই কোনখানে, আইয়া পড়ব। বস।'

বসল রমেশ। বসেই আছে। হঠাৎ দূরে আবছা অন্ধকারে যেন কী দেখল সে। তার সারা গা ঝিম্ করে উঠল। চেয়ে দেখে বিহারীদাও সেদিকে তাকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে একটা লোক মিনিকে ধরে ধরে নিয়ে এল। যেন মিনির ঠ্যাং ভেঙেছে হাঁটতে পারছে না। লোকটা বলল, 'এমন দিনে ওকে এনেছ কেন?' মিনিকে সে ছেড়ে দিল। মিনি বসে পড়ল। লোকটা পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে তার থেকে দুটো টাকা বিহারীদার হাতে দিল।

বিহারীদা যেন আঁৎকে উঠল। 'মাত্র! আর কালকের, পরশুর?'

'দিয়েছি ত?' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল।

'আরও দেবে বলেছিলে না আজ?' বিহারীদা মিইয়ান গলায় মিনতি জানাল।

'না আর হবে না', সাফ্ জবাব দিল লোকটা।

'হবে না মানে?'

রমেশ লাফ দিয়ে এসে সামনে পড়ে এক থাবায় তার হাতের নোট ক'টা সব কেড়ে নিল।

'আমার টাকা দাও', লোকটা তেড়ে উঠল।

রমেশ ঘুষি বাগিয়ে বলল, 'একপা এগুলে দাঁত খুলে ফেলব।'

লোকটা চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। বুঝি ভয় পেল। বলল, 'আচ্ছা দেখে নেব।' বলে হনহন করে চলে গেল।

রাস্তায় নেমে আসতে আসতে বিহারীদা বলল, 'বাল-অ করলা না রমেশ।'

'তার মানে!' গর্জে উঠল রমেশ, 'টাকা আদায় করতে ডাইক্যা আনলা, টাকা আদায় কইরা দিলাম, তবু ভাল করলাম না?'

'হেইয়া কই না, তা ত বাল-অ কামই হইছে', ভীরু গলায় বলল বিহারী, 'তবে কিনা, এ রাস্তাটা বন্ধ হইল।'

রমেশ খুব রেগে গিয়েছিল, ব্যঙ্গ করে উঠল, 'কালীঘাট থেকে যারা শ্যামবাজারে বাসা বদলায় তারা উনুন পাতবার মাটি কালীঘাট থেকে আনে না। শ্যামবাজারেও মাটি পাওয়া যায়।'

'কি কইলা বুঝতে পারছি। তা টাকাটা গুনে দেখ।'

তখনও টাকাটা রমেশের মুঠোয়।

টাকাটা রমেশ তাকে এখনও দিচ্ছে না কেন, নাকি মেরে দেবার মতলব, বিহারী মনের মধ্যে ছটফট করছিল।

রাগের মাথায় রমেশ ভুলেই গিয়েছিল টাকাটা তার হাতে। মুঠো শুদ্ধ টাকাটা বিহারীর হাতে তুলে দিয়ে রমেশ বলল, 'নিজেই গুনে দেখ।'

টাকাটা হাতে পেয়ে বিহারী আশ্বস্ত হল। সুখী হল।

টাকা গুনতে গুনতে হকচকিয়ে উঠল বিহারী। 'তের টাকা। আর আমারে তখন দিল দুই। ভাগ্যে তুমি আইছিলা রমেশ, পনরটা টাকা আদায় হইল।'

খুশিতে গদগদ গলা বিহারীর। বলল, 'নাও, দুটো টাকা নাও তুমি।'

রমেশ ধাক্কা মেরে হাত ঠেলে দিল বিহারীর। বলল, 'ওই টাকায় মেয়েকে একটা রিক্সায় তুলে নেও। ওকে আজ একটু দুধ দিও। দুধ পাঁউরুটি।'

বিহারীকে তার হঠাৎ ভীষণ অসহ্য লেগেছিল। সে সেই পথের মাঝ থেকেই কেটে পড়েছিল। আর দুঃসহ এক অন্তর্দাহে জ্বলতে জ্বলতে সেই থেকে রাত দুপুর অব্দি পথে পথে ঘুরেছিল। বার বার সাবির কথা মনে পড়েছিল। সাবিকে তার ভাল লেগেছিল। সাবি যদি তার বউ হত কত সুখী হত রমেশ। কিন্তু সাবি পরিষ্কার বলে দিল কুলী-কামিনের বউ সে হবে না। বউ করতে চাইলে রমেশকে ও কথা বুঝি সবাই শোনাবে, মিনি টুনি বিলু সকলে। সকলের কাছেই সে তুচ্ছ, অযোগ্য। ওদের দেহটার বড় দাম। ওদের দেহের দাম সে জোগাতে পারবে না। তাই ওরা কেউ তার হবে না।

এমনি দিনের পর দিন অনেক দেখে অনেক শুনে আর অনেক উত্তেজনার রাত জেগে রমেশ স্থির বুঝেছে তার বউ হবে না কেউ। কোন দিন তার সংসার হবে না। আজ তাই তার সব মোহ, সব লোভ ফুরিয়ে গেছে। ক্রমশ মিনি টুনি সাবি বিলুরা সব অচেনা হয়ে উঠেছে তার কাছে। নিজেকে নিজের মধ্যে নির্জন এক দ্বীপে নির্বাসিত করে রেখেছে রমেশ, সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যে নিজেকে যে খুব মানিয়ে নিতে পেরেছে তা নয়। কখনো কখনো আসঙ্গ লিপ্সার দুঃসহ দাহে তার শরীর মন আত্মা শুদ্ধ প্রবল কম্পনে থরথর করে ওঠে। সে সব মুহূর্তে নিজেকে সে যখন আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না তখন নিজেকে পিষ্ট করে ক্লিষ্ট করে নিংড়ে নিংড়ে শূন্য করে অসাড় হয়ে যায়।

এই অভ্যাসের মধ্যে এখন রমেশ আত্মস্থ হয়েছে। কোন মেয়ের দিকে তাকিয়েই আজ আর তার মনে মোহ জাগে না, আজ

আর সে কোন মেয়েকে দেখে লুব্ধ হয় না। কমলার গায়ে পড়া ঘনিষ্ঠতায়ও আজ আর নিজের মধ্যে কোন উত্তাপ বোধ করে না রমেশ।

কমলার প্রতি আজ আর রমেশের মনে কোন মোহ নেই। ঊষার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। তবু সেই মিথ্যে অভিযোগের জন্যে এখন রমেশের রাগ হচ্ছে না। সে অবাক হচ্ছে শুধু। সে ভাবছে, ঊষার অভিযোগ যদি সত্যিও হয়, সে যদি কমলাকে ভালই বেসে থাকে তাতে ঊষার এত উত্তেজিত হবার কি আছে। ঊষাকে যদি সে ভালই না বেসে থাকে তাতেই বা ঊষা এত ক্ষুব্ধ হবে কেন? ঊষা কী চায়। সে যদি ঊষাকে চলে যেতে না দিত, সে যদি তার পথ আগলে দাঁড়াত, তার হাত ধরে বলত— ঊষা আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার বউ হবে ঊষা? ঊষা কী তক্ষুনি রাজি হয়ে যেত। অকস্মাৎ রমেশের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তার মনে হল, হয়ত রাজি হত। ঊষা কারো বউ হতেই চাইছে। ঘরের বউ, ছেলেপুলের মা। স্বামী পুত্র নিয়ে সুন্দর একটি সংসার পাতবার স্বপ্নই দেখছে ঊষা। ঊষাকে যেদিন থেকে সে চেনে, যেদিন থেকে সে তার দালালি করছে দেখে আসছে, এ লাইনে ঊষা নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না। নিতান্ত অসহায় হয়েই সে এ পথে পা দিয়েছে; কিন্তু এ পথের কাঁটায় কাঁটায় সে ক্ষত-বিক্ষত। তার জ্বালা আর সে সইতে পারছে না। কোন লোক জুটিয়ে এনে দিলে সে যে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তার চোখ মুখের দিকে

তাকিয়ে রমেশ তা অনেক দিন দেখেছে। লোক বিদেয় করে সে যখন আবার এসে পার্কে বসত তখনকার তার এলোমেলো চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নির্জীব অবস্থা দেখে রমেশের মনে হত এ লাইনের লাঞ্ছনা ওর অসহ্য লাগে, ও সইতে পারে না। আজ বুঝল, সে-ধারণা তার সত্যি। উষা আজ মুক্তি খুঁজছে। মুক্তির জন্যে আজ সে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ লাইন থেকে তাকে মুক্তি দিতে আজ যে-ই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসুক পরম বন্ধু ভেবে সে তারই হাত ধরবে। তারই বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। নিজের বুকের সব উত্তাপ দিয়ে সে তাকে ভালবাসবে। সে যদি রাস্তার তুচ্ছ একটি চা-অলাও হয় তাতেও তার আপত্তি হবে না। প্রসন্ন মনেই সে তাকে স্বামী বলে শ্রদ্ধা করবে। বন্ধু বলে ভালবাসবে।

উষার মনের এ দিকটার পানে এতক্ষণ সে তাকায়নি কেন, ভেবে রমেশ অবাক হয়ে গেল। তার মনে হল—আজকের ঝড়, সে তার নিজের বুকের যে দরজাকে একদিন শক্ত করে এঁটে বন্ধ করে রেখেছিল, তাকে প্রবল ধাক্কায় একেবারে হাট খুলে দিয়ে গেছে। সেই উন্মুক্ত দরজার পথে অনেকদিন পরে সে আবার দেখতে পেল তার পুরাতন সেই প্রিয় স্বপ্নকে! যে স্বপ্নকে সে জোর করে নির্বাসন দিয়ে নিজেকেই আর এক নির্জন অন্ধকারে দ্বীপান্তরিত করেছিল।

রমেশের ইচ্ছে হল এখনই সে ছুটে যায়। যেখানে উষাকে খুঁজে পায় ধরে। শুধোয়, এ কী সত্যি উষা, সত্যি কী তুমি আমার বউ হবে? উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল রমেশ। ঝোলাটাকে কাঁধে তুলে নিল, শিকেয় আঁটা কলসিটাকে ঝুলিয়ে নিল হাতে। চা হাঁকতে হাঁকতে উষাকে সে খুঁজবে। পার্কে গুমটিতে রাস্তায় এদিকে ওদিকে যেখানে হোক তাকে পাবেই। কিন্তু তক্ষুনি

আবার সন্দেহ জাগল রমেশের মনে। মনে পড়ল রমেশের প্রশ্নের জবাবে উষা বলেছিল—এখানে দাঁড়াব না, ত ওই পুরুষগুলির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব নাকি! অর্থাৎ আজ কোন পুরুষের সংসর্গে আসতে চায়নি উষা, আসবে না আর, এই সংকল্প করেই বুঝি সে আজ এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আশায়ই হয়ত সে তাকে চরম প্রশ্ন করেছিল—বল রমেশদা, আমি তোমার কে?

রমেশ তার জবাব দিতে পারেনি। যে-জবাব উষা আশা করেছিল সে জবাব দিতে পারেনি রমেশ। বড় আগ্রহে বড় ভরসায় সে প্রশ্ন করেছিল, সে আগ্রহ সে ভরসার বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় সে রমেশের কাছ থেকে পায়নি। উষা আহত হয়েছে, হতাশ হয়েছে, হয়ত খুব দুঃখও পেয়েছে। রাগ করে চায়ের দাম ছুঁড়ে দিয়ে যে ভাবে সে চলে গেল তারপরে আর কোথাও অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে অপেক্ষা করছে বিশ্বাস করতে ভরসা হল না রমেশের। ওর খোঁজে এখানে ঘোরা এখন বৃথা হবে। বিষণ্ণ হয়ে উঠল রমেশ, তবে বুঝি আজ আর ওর দেখা পাবে না রমেশ। রমেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। কী করা যায়। কী করবে সে।

উষা তাকে একদিন কথায় কথায় তার বাড়ির ঠিকানা বলেছিল। ঠিকানা···

ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ ঠোঁট কামড়ে রইল রমেশ, অন্ধকারে চোখ পেতে চুপ করে রইল আরও অনেকক্ষণ। না। ঠিকানাটা কিছুতে মনে পড়ছে না। কিন্তু উষা তার বাড়ি যাওয়ার যে ম্যাপটা বালির ওপরে কাঠি দিয়ে এঁকে দেখিয়েছিল সেইটে হঠাৎ মনে পড়ল। টালিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়ি ছাড়িয়ে আদি গঙ্গার পুল। পুল পার হতে হবে না। পুলের গোড়ায় এসে

গঙ্গার পারে নামতে হবে। খানিক দূর এগুলে বাঁদিকে একটা গলি পাওয়া যাবে। সে গলির বাঁয়ে আর একটি সরুগলির মধ্যে ষষ্ঠীর মার বস্তি। ষষ্ঠীর মা আজ আর বেঁচে নেই। ষষ্ঠীই এখন মালিক।

ঠিকানা না জানলেও সেখানে যাওয়া কঠিন নয়; কিন্তু আজ এখন সে সেখানে যায় কি করে। এই রাতে হঠাৎ সেখানে গিয়ে হাজির হলে লোকে কী ভাববে। উষাই বা কী মনে করবে। হয়ত ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়বে। অগত্যা রমেশ শিয়ালদার দিকে পা বাড়াল।

আজ একটা রেসের ঘোড়ার মত হেঁটে চলেছে রমেশ। পায়ে খুর থাকলে টগবগ টগবগ শব্দ হত। আজ আর কোন দিকে তাকাচ্ছে না রমেশ। তুচ্ছ একটা জিনিসের দিকে অহেতুক একটা কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে না দশ বিশ মিনিট। আজ রমেশের হাতে নষ্ট করবার সময় নেই। কতক্ষণে দেহটাকে টানটান করে মেলে দেবে বিছানায়, একটা রমণীয় চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবে সেই তার ভাবনা।

অন্যদিন ধর্মতলা শিয়ালদার এই পথটা শামুকের মতন ধীরে ধীরে পার হয় রমেশ। তখন তাকে হাঁটতে দেখলে মনে হবে বুঝি একটা শ্লো রেস-এ ফাস্ট´ হবার জন্যে প্রাণপাত করছে রমেশ। মাঝে মাঝে আবার দাঁড়িয়েও পড়ে। দেখল কোন পানের দোকানে একটা বাল্‌ব-এর ওপরে সেলুলয়েডের একটা রঙিন টুপি বনবন করে ঘুরছে; ফ্যালফ্যাল করে হয়ত তার দিকেই তাকিয়ে রইল দশ মিনিট। রাস্তা পার হতে দাঁড়িয়ে কাটাল আধ ঘণ্টা। এই রকম।

রমেশ ভাবে, কী হবে প্রাণ হাতে করে এমন ছুটতে ছুটতে গিয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোথায় যাবে রমেশ। তার পথের

প্রান্তে কে তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। খড়কুটো কুড়িয়ে ফলের ঝুড়ি কাঠ-চাঁচা কিনে তুটো চাল ফুটিয়ে এক মুঠো ডাল সেদ্ধ করে কে আর তার আসার সময় গুনছে। ময়লা নোংরা হাজার সেলাই একটা সাড়ি পরে হাড় জিরজিরে তেমন একটি বউও যদি তার পথ চেয়ে জেগে থাকত তবে কি সে এমন করে ঘণ্টায় এক হাত হাঁটত? মিনিটে হাজার গজ হেঁটে মুহূর্তে গিয়ে তার সামনে হাজির হত। একটা কলাই ওঠা থালায় তুজনে একসঙ্গে খেতে বসত। খেতে খেতে হাজার রকম গল্প বলত। হাসত। আর সেই আধ-ফোটা আধ-সেদ্ধ ডাল ভাতই পরম তৃপ্তিতে খেয়ে উঠত তুজনে! তুজনে একসঙ্গে একটা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে পড়ত। তখন সেই কালো নোংরা হাড় বের-করা বউ-র বুকের মধ্যে চোখ বুজে মনে হত এই তার স্বর্গ।

এটা রমেশের কল্পনা নয়। হারু আর হারুর বউকে সে নিত্য দেখে। একজোড়া রোঁয়া-ওঠা শালিকের মতন স্টেশনের কোণে ফলের ঝুড়ি ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা বাক্স-প্যাঁটরার দেয়ালের মধ্যে এই করেই ওরা স্বর্গ বানিয়ে আছে। হারুর বউটি সত্যি ভাল। কমলা যাদের সীতা সাবিত্রী বলে ও হয়ত তাদেরই একজন। না হয়ে উপায় কি! ওই কালো কংকালের মুখ পয়সা দিয়ে দেখতে চাইবে কে?

অথচ সেই বউ নিয়েই হারুর কত দেমাক। কত জাঁক। বউয়ের কথা উঠলে আর থামতে চায় না হারু। থামানো যায় না তাকে। রমেশ একদিন আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠেছিল, 'তবু যদি তোর বউয়ের গায়ে একটু মাংস থাকত, রঙটা হত আর একটু ফরসা।' হারু ক্ষেপে উঠে বলেছিল, 'তুই ত তাও একটা জোটাতে পারলিনে।'

পারে কিনা এবার দেখাবে সে হারুকে। রমেশের ইচ্ছে হল

স্টেশনে পৌঁছে এখনই গিয়ে ধরে সে হারুকে, বলে, দেখিস হারু আমিও এই শিয়ালদার স্টেশনে তোর মতন স্বর্গ গড়ব। আমার স্বর্গ দেখলে তুই ঈর্ষায় মরবি। আমার বউ তোর বউয়ের মত রোঁয়া-ওঠা শালিক নয়, রীতিমত স্বর্গের অপ্সরী। কিন্তু কথাটা যেন মনের ভেতর থেকে এসে সহসা কানের ভেতরে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটাল। তার উত্তাল উত্তেজিত কল্পনাটা একটা ফাটা বেলুনের মত নিমেষে চুপসে গেল। কোথায় আসবে উষা! কোথায় তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে রমেশ। তার থাকার মধ্যে আছে ত তেল চিটচিটে বালিশ একটা, একটা ছেঁড়া নোংরা কাঁথা। আশ্রয় বলতে ওই ত স্টেশনের ছাদ। সেই ছেঁড়া কাঁথার অংশ নিতে ওই স্টেশনের ছাদের নিচে উষা মাথায় ঘোমটা পরে তার বউ হয়ে আসবে? কয়েকজন পথচারীকে চকিত করে হো হো করে হেসে উঠল রমেশ। এই স্টেশনের বউরাই ত মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে স্টেশন ছেড়ে পথে নেমে যায়। যে-পথে তারা সবাই হারিয়ে যায় সে-পথের থেকে কিসের লোভে উষা মাথায় ঘোমটা তুলে এখানে উঠে আসবে। এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ রমেশ যেন কেমন গুম হয়ে গেল। তার মাথার মধ্যেকার যত সবুজ চিন্তা যত রঙিন স্বপ্ন সব যেন কার বিষে নিমেষে নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একটা শূন্য খাঁ খাঁ প্রান্তর হয়ে গেল সে। একটা উষর প্রান্তর। যেখানে ধুলো আর কাঁকর। গাছ নেই। ঘাস নেই। ফসলের কোন সম্ভাবনা নেই। শুধু ফুটি-ফাটা একবুক পিপাসা নিয়ে যে পিঙ্গল আকাশের নিচে দিনরাত খালি পুড়ছে। ধুঁকছে। যার বুকে একশ হাত খুঁড়লেও এক ফোঁটা রস মেলে না সেখানে মস্ত এক ঘড়া নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল উষা। উষাটা কি বোকা!

ঘ

উষা যদি চতুর হত, কমলার মত চতুর, তবে ওর ওই মাখনের মত চেহারা আর মোমের মত মনের জন্যে কমলার থেকে বেশি পসার হত ওর। হয় ত কোন বড়লোক এতদিনে ওকে পরম যত্নে রক্ষিতা করে রাখত। আলদা বাসা করে ঝি চাকর রেখে দিত। মোটা টাকা মাসোহারা দিত। যদি মন দিয়ে চেষ্টা করে ওর ভাগ্য ফেরাতে ওর এখনই বা কতক্ষণ লাগে। কিন্তু সে চেষ্টায় না গিয়ে রমেশের জন্যে, একটা ফেরিঅলার ভালবাসার জন্যে কী কাঙালপনাই না সে করল আজ। উষাটা সত্যি বড় বোকা, আবার করে ভাবল রমেশ। কিন্তু এ কথাও রমেশ না ভেবে পারল না যে, উষা বোকা বলেই আজ তার মনে এত আনন্দ, এত সুখ।

একটা দুরন্ত সুখানুভূতিতে রমেশের চোখে আর ঘুম আসছিল না। এমন যে রেসের ঘোড়ার মত জোর কদমে হেঁটে এল, নিত্যকার থেকে বেশি আরও দুখানা রুটি খেল, ঢক্‌ঢক্ করে জলও খেল গলা সমান, তবু রমেশের শরীর এলিয়ে পড়ছে না ঘুমে। বিছানায় টানটান শুয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে সে শুধু চেয়েই আছে। অন্যদিন হলে এতক্ষণে গভীর ঘুমে কাদাকাদা হয়ে যেত রমেশ। আজ ঘুম পালিয়েছে। কোন্ ঘুম-চোর নিঃশব্দে এসে তার চোখের ঘুম লুফে নিয়েছে। কিন্তু তার জন্যে তার কোন গ্লানি অস্বস্তি লাগছে না। ঘুমের কথা আজ মনেই আসছে না তার। আজ মন তার অরণ্য পাহাড় তেপান্তর পেরিয়ে ছুটেছে। সে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যাবে তার রাজকন্যাকে আনতে। কী উৎকণ্ঠা, কী উদ্বেগ তার বুকের মধ্যে। এতটুকু

দেরী হলেই আর বুঝি রাজকন্যাকে পাবে না সে। "হালুম লো, হলুম লো মাংসের গন্ধ পাইলাম লো" বলে হাজার হাজার রাক্ষস বুঝি আকাশ অন্ধকার করে তেড়ে আসছে। আর একটু পরেই রাজকন্যাকে চেটেপুটে খেয়ে সাবাড় করে দেবে তারা।

রমেশ এখন আপসোস করছে। কী আর এমন রাত হয়েছিল তখন। অসময়টা কী ছিল। উষা ত তখনই ফিরেছে। সে না হয় তার ঘণ্টাখানেক পরে গিয়ে পৌঁছত। উঃ, কী ভীষণ ভুল করেছে রমেশ। কী সাংঘাতিক বোকামো করেছে। উষা রাগের মাথায় এখন হয়ত কত কী ভাবছে। হয়ত ভাবছে, কী দরকার ছিল একটা ভিখারির অধম ফেরিঅলার কাছে অমন কাঙালপনা করবার। করেই বা কী লাভ হল। সে যে এমন করে অভিমান করে চলে এল, সে ত কই তার মান রাখল না। ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়াল ত না, বলল ত না, উষা, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার ঘরে এস। সে যে তাকে ঘরে ডাকবে, সেই ঘরই বা কই তার! একটা হা-ঘরে মানুষের কাছে সে যে কেন এমন অপমান হতে গেল, সে কথা ভেবেই হয়ত এখন সে অবাক হচ্ছে, রাগ করছে নিজের ওপরে। এখন হয় ত সে নতুন করে ভাবছে, যে পথে সে আছে সে পথের আরামের কথা সচ্ছলতার কথা। একবার যখন পথে নেমেছে আর সে ঘরে ফিরবে না, ঘর বাঁধতে চেয়ে একবার যখন সে অপমানিত হয়েছে আর সে ঘর বাঁধবে না, পথের জীবনেই সে তার নারী জনমের সবটুকু সুখ কুড়িয়ে নেবে এতক্ষণে হয়ত এ প্রতিজ্ঞাই সে আবার করে বার বার করছে বসে।

কিন্তু এতক্ষণে সত্যি যে উষা সে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে এ বিশ্বাসকে নিজের মনের মধ্যে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারল না রমেশ। উষার তখনকার সেই আকুল জিজ্ঞাসা, রাগ করে পয়সা

ছুঁড়ে দেবার সময় তার সেই গ্রীবাভঙ্গী, একটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মত ছুটে বেরিয়ে যাওয়া—বার বার মনে পড়তে লাগল রমেশের। সে মাথা নেড়ে নেড়ে বার বার মনে মনে বলতে লাগল, না না উষা ওপথে আর থাকতে পারে না। থাকবে না। থাকবে এ বিশ্বাসকে রমেশ কিছুতেই মন দিয়ে মেনে নিতে চাইল না। তাহলে যে-সুখের স্বপ্ন এখন তার সমস্ত দেহ মন জুড়ে বসে আছে সে-স্বপ্নকে ওই বিশ্বাস যে এখনই নির্বাসিত করবে। রমেশ ভীত হল। উদ্বিগ্ন হল। দুই বিপরীত চিন্তার দ্বন্দ্বে পীড়িত মন নিয়ে মেন-স্টেশনের ঘড়িটার দিকে বার বার করে তাকাতে লাগল রমেশ। সকাল হতে আর কত বাকি দেখতে লাগল। আর সেই সকাল হবার সময়ের ঘণ্টা মিনিট মুহূর্তগুলি গুনতে গুনতে স্টেশনের এককোণে হারুর মত সুন্দর একটি সংসারের স্বর্গ তাকে আচ্ছন্ন আবৃত করে ফেলল। স্বপ্নাবিষ্ট রমেশ এক সময়ে নিজের শয্যায় উষাকে যেন তার বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগল। অল্পে অল্পে সে দুরন্ত সুখানুভূতি সুতোর গায়ে মিছরির দানার মত স্বপ্নের ওপরে ঘুমের নক্সী কাঁথা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একটা গহন ঘন ঘুমের আচ্ছাদনের তলায় উষার স্বপ্নে হারিয়ে গেল রমেশ।

রমেশের ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়।

ক্যানিঙ-এর গাড়ি তখন লম্বা হুইস্‌ল্‌ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছে। রমেশ বিছানায় উঠে বসল।

ছেঁড়া নোংরা লটবহর, ভাঙা ফুটো তোবড়ানো এনামেল এলুমিনিয়মের বাসন-কোসন, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি কাঠ চাঁচা, ফুলের ঝুরি এমনি আরও নানা আবর্জনা স্থানে স্থানে ডাঁই করে রাখা। তারই আড়ালে আবডালে কোথাও ছেঁড়া শাড়ি-ধুতির আবরু ঘেরা, কোথাও বেআবরু ছোট ছোট সংসার। সংসারের মানুষগুলি

শুকনো হাড়সার মেয়ে পুরুষ সব এখন কেউ উঠে বসেছে। কেউ শুয়ে আছে এখনও। তাদের গায়ের ওপরে এধারে ওধারে জানোয়ারের বাচ্চার মত ছেলেপুলেগুলি পিলপিল করছে। হাত পা ছুঁড়ছে কেউ। কেউ তারস্বরে কাঁদছে। যে বাচ্চাগুলির আরও একটু বয়স হয়েছে সেগুলি উদম-শরীরে ছুটোছুটি করছে। প্যাসেঞ্জারদের পায়ে পায়ে ঘুরছে। একটা ধূলো-ময়লা মাখা নোংরা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুর করে বলছে, 'বাবু একটা পয়সা···বাবু··· বাবুগো।' যুবতী মেয়েগুলি যারা, কিছু রোজগার করে, কিছু রোজগারের জন্যে, আশায় অভ্যাসে সারারাত জেগেছে, এদিকে-ওদিকে ঘুরেছে, তাদের কাজলে-চকে আলতায় মাখামাখি চোয়াল-ওঠা মুখগুলি এখন তারা কোণে কোণে বসে মগের জলে ঘষে ঘষে ধুচ্ছে। কোথাও গলা সাধছে কেউ। কেউ হারমোনিয়ম শিখছে। কাদের মধ্যে কোথায় ঝগড়া বেঁধেছে, তাদের শ্লীল-অশ্লীল গালি-গালাজ শোনা যাচ্ছে। কোথায় কে যেন কাকে কয়েক ঘা চড়-চাপড় মারল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদছে। কোথাও বাচ্চাদের গুয়ের কাঁড়ি কোথাও মুতের ঢল। দুর্গন্ধে ভুরভুর চারধার। শিয়ালদা স্টেশনের উদ্বাস্তু পল্লী। পল্লীর প্রত্যেকেই যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মগ্ন। একজনের দিকে আর একজনের ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ পারতপক্ষে কারো ব্যাপারে নাক গলায় না।

রমেশ উঠে বসে ঘুম-ঘুম চোখে দেখল, একটা ছারপোকা পালাচ্ছে। রমেশ শিকারী পাখির মত টপ্ করে সেটাকে দু'নখে তুলে নিল। তখনই দেখে আর একটা ছারপোকা বালিশের কোণে ঘাপটি মেরে আছে। এস্‌শা···বলে দাঁতে-দাঁতে একটা চাপা শব্দ করে হাতেরটাকে টিপে মারল রমেশ। তারপর সেইটাকে ধরতে হাত বাড়াল। বালিশটা নড়ে উঠল। ছারপোকাটা টুপ করে কাঁথার ওপর পড়ে কাঁথার একটা ছেঁড়া ফোকরের মধ্যে ঢুকে গেল।

রমেশ হেসে উঠল। হাসিটা মিলিয়ে গেলে তার একটা বিবর্ণ বিষণ্ণ ছাপ লেগে রইল তার মুখে। সে ভাবল, তার বড় পাগল দুনিয়াতে আর নেই। এই তার বিছানা। উদ্বাস্তুর এই স্টেশন-পল্লীতে এই বিছানায় উষা তার সঙ্গী হবে, সারারাত ধরে কেমন করে সে এই কল্পনা নিয়ে ঘুমিয়েছিল। সত্যি বটে তার ভালবাসা পায়নি বলে উষা কাল সন্ধ্যায় তার কাছে কাঙালপনা করেছে। উষা তার ভালবাসা চায়। তার ভালবাসা পেলে বর্তে যায়। এ সবই যদি সত্যি বলে ধরে নেয় রমেশ, তবু তাতে করে কেমন করে প্রমাণ হয়, সে তার বউ হবে! বউ হতে চায়! কমলা বলেছিল—'তোমার ওই সবল সমর্থ যৌবনটার জন্যে আমার বড় লোভ হয় রমেশদা।' কমলা যে লোভের কথা মুখে উচ্চারণ করেছিল অনুচ্চারিত সে লোভের জ্বালা উষার মনেও ত থাকতে পারে। অধিকন্তু থাকতে পারে একটি মানুষকে বাঁধা রাখবার মতলব। সে নিজে মানুষ জোটাতে পারে না। তার জন্যে মানুষ জুটিয়ে আনতে একজন যদি লোক থাকে—তার শরীর বেচা পয়সা দিয়ে যাকে সে পালবে, তার শরীরের লোভ দিয়ে যাকে সে পুষবে, অন্ধ করে রাখবে। সে তার স্বামী হবে না, হবে প্যানা। প্রেমের নাগর। রমেশকে সেই প্যান্না করবার জন্যেই কী কালকের এই অভিনয় উষার। রমেশের দৃঢ় বিশ্বাস হল—তাই। সত্যি তাই। তা নয়ত একটা চা ফেরিঅলার বউ হতে চাইবে সে কোন লোভে! দেহ? এমন দেহ সে রোজ পায়। একটা চা ফেরিঅলা যা কোনদিন স্বপ্নে দেখে না এমন টাকা সে রোজ রোজগার করে, এমন জিনিস সে রোজ খায় (অন্তত একটু চেষ্টা করলেই সুখের সব কিছু তার মুঠোর মধ্যে)। তবে সে কেন আসবে? চাল নেই চুলো নেই এমন একটা মজুরের বউয়ের বেড়ি পরে ধুঁকে ধুঁকে মরবে সে কোন দুঃখে?

রমেশের মুখের বিবর্ণ হাসিটা ঘৃণায় বেঁকেচুরে বীভৎস হয়ে উঠল।

উষার প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধে তার দেহের সব রক্ত মাথায় উঠে চনচন করতে থাকল। সে তার দালাল বলেই কাল কী তাচ্ছিল্য দেখাল তাকে। প্যানা হলে ত পায়ে হোঁচট দিয়ে চলবে। দালাল সে হয়েছে, দালাল সে থাকবেও। ঘৃণার কাজ। তবু স্বাধীন ব্যবসা। টাকার জন্যে সব কিছু সে পারে। করবে। টাকা দিয়ে কেউ যদি গুয়ের কুটো দাঁত দিয়ে তুলতে বলে সে তাও তুলবে। তার টাকা চাই। টাকা হলে কোন গ্লানি তখন আর তার গায়ে লেগে থাকবে না। টাকা হল লক্ষ্মীর পায়ের ধূলো। সে যদি নরকেও পড়ে তবু পবিত্র। টাকাই তাকে পবিত্র করবে। কিন্তু তাই বলে একটা বেশ্যার পুষ্যি হবে নাকি রমেশ। থু-উ করে এক দলা থুথু ছুঁড়ে দিল রমেশ। হাত বাড়িয়ে ঝোলার থেকে একটা নিমকাঠি নিয়ে সেটাকে চিবুতে লাগল প্রাণপণে। ভাবল: ভাগ্যিস কথাটা তার এখন মনে পড়ল নইলে ত মুখ হাত ধুয়ে এতক্ষণে সে ষষ্ঠীর মার বাড়ির জন্যে টালিগঞ্জের বাসে উঠে বসত। কমলাটাকে একদিক থেকে খুব ভাল বলতে হবে। হাসি-খুসি। আলাপী। মনে-মুখে এক। মনের কথা মুখে বলতে তার আটকায় না। বলে যখন, তার অর্থ বুঝতেও কষ্ট হয় না। কমলাটার মনে কোন শয়তানী নেই। উষাটা তার উল্‌টো ভীষণ সাংঘাতিক মেয়ে। যারা হাসে কম, কথা বলে কম তারাই সাংঘাতিক। মুখ দেখে বোঝবার জো নেই মনে কী। কথা শুনে বোঝবার জো নেই তার মানে কী। এমন একটা ভয়ানক মেয়েকে সে ভেবেছিল কিনা অতিশয় নিরীহ। সৎ আর সরল। কেমন করে যে রমেশ ভাবল উষা এ লাইন ছেড়ে দিতে চাইছে, এ লাইন তার সইছে না, রমেশ ভেবে পেল না। এখন তার মনে হল এসব-ই উষার শয়তানী—অভিনয়।

সারাদিনটাই রমেশ দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিল। উষার কথা সারাদিনে বেশি মনে পড়েনি। মনে পড়লেও আমল দেয়নি রমেশ। ও

বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত সে করে ফেলেছে বলেই বিশ্বাস করেছিল রমেশ। সন্ধ্যার সময় ধরমতলায় যখন চা বেচতে এল তখনও বিশ্বাসটা তার অটুটই ছিল। ধরমতলার ট্রামগুমটিতে পার্কে ইতস্তত চা হেঁকে হেঁকে ঘুরল রমেশ। রাত আটটা বেজে গেল তখনও রমেশ টের পায়নি তার সকাল বেলাকার শেষ সিদ্ধান্তের ভিতে মস্ত ফাটল ধরেছে। ভেঙে পড়ার আগে তার মনের শক্ত বিশ্বাসের খুঁটিটা কাঁপছে থরথর করে। বার বার হতাশ হয়ে হঠাৎ তার খেয়াল হল। সে যেন কাকে খুঁজছে। যেখানেই আঁধার-আলোর-মেশামেশি ছায়ায় দু একটি রঙ করা মুখকে ঘুরতে-ফিরতে দেখেছে সেখানেই সে দ্রুত পায় এগিয়ে গেছে, খুব কাছে যাবার আগেই থেমেছে; ফিরে অন্যদিকে গেছে। না। যাদের সে খুঁজছে ওরা কেউ তারা নয়। কমলা বা ঊষা আজ কেউ আসেনি। চুলোয় যাক কমলা, মরুক গে সে যেখানে খুশী; কিন্তু ঊষা কই, সে এল না কেন? রমেশের পা যেন আর চলতে চায় না। পা দুটো কাঁপছে, যেন সে কত হেঁটেছে, কত পরিশ্রম করেছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। রমেশ এক জায়গায় ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। নিজেকে নতুন করে আর একবার আবিষ্কার করল রমেশ।

বড় আশা ছিল রমেশের মনে। আজ রাতে আবার যখন দেখা হবে ঊষার সঙ্গে, নতুন করে কালকের কথা হবে। যে অভিযোগের কোন মানেই তার কাছে স্পষ্ট হয়নি তার মানে স্পষ্ট করে বুঝে নেবে ঊষার কাছ থেকে। যে ভাগ্য তার অতি দুঃসাহসেরও অগোচর, অতিশয় দুর্লভ বলে যে আশাকে সে প্রশ্রয় দিতে মোটেই ভরসা পায়নি কখনো, সে ভাগ্য কি তার হবে? সে সংসারী হবে, ঊষা তার বউ হবে? আজকে ঊষাকে স্পষ্টভাষায় সে-কথাই সে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল। তার মনের অনেক গভীরে এই সিদ্ধান্ত

স্থির হয়ে ছিল বলেই বুঝি সারাদিনে আজ রমেশ এতটুকু অশান্ত বিচলিত হয়নি। সূর্য ডুববে। সে ধরমতলায় যাবে। উষা আসবে। তাদের সাক্ষাৎ হবে। তারপর রমেশের মনে পড়ল, সারাদিন এ কথাই বুঝি সে ভেবেছে। বড় আশা করে ছিল। উষাকে সে তার স্বপ্নের কথা বলবে। বড় আশা ছিল তার মনে, সে গল্প শুনে উষা বলবে সে স্বপ্নকে সত্য করে নাও রমেশদা। আমি ক্লান্ত, আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। রক্ষা কর।

রমেশ আর ভাবতে পারল না। সে ঘাসের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার চোখভরে জল এসেছিল ; তাই ঢাকতে সে চোখে হাত চাপা দিল। ভাবতে লাগল, আজ আর সে ভয় পাবে না, আজ সে উষার বাড়ি যাবে। রমেশ নিশ্চয় হল, উষা এ-লাইনে আর আসবে না। এখানে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। কাল এমন করে সে জলের ছাঁটে ভিজছিল তবু পুরুষমানুষদের কাছে-পিঠে কোথাও গিয়ে দাঁড়ায়নি। কাল তবে কেন সে এসেছিল? রমেশের মনে হল, এ লাইন ছেড়ে দিলে কোথাও ত তার একটা আশ্রয় চাই ; রমেশের কাছে সেই আশ্রয় চাইতেই সে এসেছিল। সরাসরি বলতে পারেনি। কিন্তু বড় আকুল হয়ে জানতে চেয়েছিল—'বল রমেশদা আমি তোমার কে?'

নাঃ, আর ভাবতে পারছে না রমেশ। সে উষার কাছে যাবে। তার বাড়ি যাবে। চোদ্দ নম্বর বাস ধরে সে সাপুরের পুলের কাছে নামবে।

কাঁধে ঝোলা হাতে কলসি রমেশ রাস্তা পার হয়ে মেট্রোপলিটনের বাড়ির তলায় এল। তখন চারদিক থেকে কাণে গেল চীৎকার—'হল্লা'। ফাউনটেন পেন, রুমাল হ্যাংগার খেলনা প্লাস্টিকের নিত্য দরকারী নানা জিনিস ফুটপাথের ধারে ছড়িয়ে নিয়ে

যে যা বেচছিল কোন রকমে সেগুলিকে কুড়িয়ে তুলে যে দিকে পারল পালাতে থাকল। রমেশও পালাতে যাবে তখন তার কবজি চেপে ধরল এক পুলিশ। 'হল্লা' রমেশকে এই প্রথম ধরল না। 'হল্লা'র অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে। কিন্তু আজ মনে হল, পুলিশের হাতটা যেন তার কবজির হাড়ে গিয়ে লেগেছে। কবজির হাড় টন্‌টন্‌ করছে। কবজি থেকে সে টন্‌টন্‌ ব্যথাটা বুকের হাড়ে এসে লাগছে। বুকে ব্যথা করছে। বুকের হাড় ভাঙছে। রমেশের মনে হল পুলিশ তার হাত ধরেনি। তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুট্‌ দিয়ে বুকে পাড়া দিয়েছে। বুটের চাপে তার বুকের হাড় মুচমুচ করে ভাঙছে।

চার

পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ঊষা সেই যে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, থেমেছিল একেবারে বাস স্টপে এসে। ট্রাম বন্ধ। বাসে বিষম ভীড়। এ ভীড়ের বাসে কী করে উঠবে, আদৌ উঠতে পারবে কিনা, ভাবছিল ঊষা। তবু চোদ্দ নম্বর বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। এলোমেলো ভাবছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সহসা শিউরে উঠল ঊষা। ঝোঁকের মাথায়, নিতান্তই অভিমান বশে, সে যে কাণ্ড করে এসেছে এতক্ষণে তার গুরুতর দিকটা যেন তার উপলব্ধিতে এল। হঠাৎ তাকে কী যে ভূতে পেয়ে বসেছিল! অথচ অন্তর্যামী জানেন, এত সবের কিছুই তার মনে ছিল না। তার ব্যবহারে রমেশদা নিশ্চয় ভীষণ রেগেছে। অপমান বোধ করেছে। সে হয়ত এর পরে আর ঊষার মুখ দেখবে না। ঊষাকে দেখে দূর থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। কী সর্বনাশ! না, এক্ষুনি সে ফিরে যাবে। ক্ষমা চাইবে গিয়ে। যে-ব্যথায় জ্বলে উঠে রমেশদাকে সে এমন করে জ্বালিয়ে এল সে-ব্যথার কথা বলে সে তার কাছে নিজেকে নিবেদন করবে। ভাবতে বুকটা যেন ঊষার পালকের মত হাল্‌কা হয়ে গেল। এতক্ষণ বুকটা যেন তার ভীষণ ভারি হয়ে ছিল। পাথর-চাপা হয়ে ছিল যেন বুকটা। খুশি হল খুব। ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। তখন দেখে চোদ্দ নম্বর বাস আসছে।

উঃ কী ভীড়! এত লোক যে শুধু পাদানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে

পারে উষা তা জানত না। এত মানুষের বোঝার ভারেই বুঝি যন্ত্রণায় জন্তুর মতন গোঁ গোঁ চীৎকার করে ছুটছিল বাসটা। সে প্রচণ্ড শব্দ ও গতি উষার নরম হয়ে আসা মনটাকে বুঝি আবার তাতিয়ে দিল। মোড় ঘুরিয়ে দিল চিন্তার। না, সে আর এখন ফিরে যাবে না। যে-মানুষ একটা মেয়েমানুষের মনের নিদারুণ যন্ত্রণা তার মুখ দেখে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না, তাকে এমন করেই বলতে হয়। বেশ করেছে বলেছে। মনের মধ্যে সে একটা প্রবল উত্তেজনা, যন্ত্রণা বোধ করল। সে-যন্ত্রণা সে-উত্তেজনা বশেই সে ছুটে গেল বাসের সামনে। বাসটা সবে তখন থেমেছে। ঠাসাঠাসি মানুষে বাসের দরজাটা যেন একটা নিরন্ধ্র দেওয়াল। দরজাতেই যখন এই, ভিতরে না জানি কী! অসহায়ের মত থমকে দাঁড়াল উষা। তবু জেদের বশে ভাবল, যাই হোক, কোন মতে সে যদি একটু দাঁড়াতেও পারে, সে যাবে। সে যাবেই।

ভিতর থেকে কণ্ডাক্টর চেঁচিয়ে উঠল। 'লেডিজ উঠবেন না। লেডিজ সীট নেই।'

'লেডিজ সীট নেই বলে কি লেডিজ উঠবে না। তারা রাস্তায় পড়ে থাকবে।' কয়েকজন প্যাসেঞ্জার প্রতিবাদ করে উঠল। 'আসুন আপনি', বলে কয়েকজন নেমে দাঁড়াল রাস্তায়।

ভিতরে ঢুকে, আশ্চর্য, উষা সুন্দর একটি জায়গা পেয়ে গেল। জায়গা ছেড়ে দিলেন এক ভদ্রলোক। আশার অতীত। জানালার ধার। অল্প অল্প বৃষ্টির ছাঁট আসছে আর হাওয়া। খুব ভাল লাগল উষার। ঠাসাঠাসি লোক বাসে। ঝড় উঠলেও কেউ জানালা বন্ধ করবে না। দম বন্ধ হয়ে মরবে নাকি! উষা নিশ্চিন্ত হল। জানালায় কনুই পেতে, তাতে চিবুক রেখে মাথাটা হাওয়ায় মেলে দিল।

দুরন্ত বেগে বাস ছুটছে। হাওয়া উস্কখুস্ক করে উড়িয়ে

নিতে চাইছিল উষার চুল। চুল শুদ্ধ মাথাটা। পারছিল না। সারা মাথায় মুখে দুরন্ত মানুষের মতন কেবল হাত বুলোচ্ছিল, বিলি কাটছিল। চিনির দানার মতন বিন্দু বিন্দু জলের কণা এসে লুটিয়ে পড়ছিল মাথায় গালে ঠোঁটে। শিরশির করছিল শরীর। শির-শির করছিল মন। বড় ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল সেই দুরন্ত হাওয়া আর সেই বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিটাই শুধু নয়, ভাল লাগছিল রমেশদার সঙ্গে এই মাত্র ঝগড়া করে আসার স্মৃতিটাও। আসলে ঝগড়ার সেই মিষ্টি স্মৃতিটাই—দুরন্ত হাওয়ার দস্যিপনা, বৃষ্টি-বিন্দুর ছোট ছোট চুমকুড়ি মিষ্টি করে তুলছিল। বাসে উঠবার আগেকার সেই ভয় আর জেদ-মেশান উত্তেজনাই আর ছিল না। দুরন্ত হাওয়া বুঝি উড়িয়ে নিয়েছিল ভয়টাকে, জেদটাকে ভিজিয়ে মিইয়ে দিয়েছিল বৃষ্টির বিন্দুগুলি, উত্তেজনাটা থিতিয়ে গিয়েছিল বাসের ঝাঁকুনিতে। নতুন আর এক কল্পনায় খুশিতে ভরে উঠেছিল উষার মন। মুখটিপে হাসছিল সে মনে মনে।

রমেশদা রেগে গেছে খুব, সন্দেহ নেই, কিন্তু বেকুফও বড় কম হয়নি। সে নিশ্চয় ভেবে পাচ্ছে না, কি হয়েছিল উষার। কোনদিন ত সে এমন করে না। আজ কেন এমন হল। রমেশদা কূল পাবে না ভেবে। ভেবে কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না। তবু ভাববে। উষাকে ভাববে। আবার না দেখা তক ভাববে। আজ রাতে ঘুম আসা তক। কাল সারাদিন। উষার মূর্তিটা তার চোখের সামনে থাকবে। থাকবে রাতের স্বপ্নে, দিনের কল্পনায়। সে মূর্তি কি তার মনে এতটুকু দাগ কাটবে না! কাটা-দাগে এতটুকু জ্বালা ধরাবে না! শূন্য বিছানায় এই দেহের স্বপ্ন দেখে কি একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে আসবে না তার বুক চিরে। আসে যদি সেই উষার লাভ। দীর্ঘশ্বাসের ধারাল ফলার টানে টানে রমেশদার মনের জমি চাষ হবে। আজ রাত থেকে কাল সারাদিন।

কাল সন্ধ্যার পরে সে-তৈরি জমিতে বীজ বুনবে উষা। আশার বীজ, ভালবাসার বীজ, সুন্দর একটি সংসারের বীজ।

রমেশদাকে পার্কের নির্জনে টেনে নিয়ে যাবে। দুজনে বসবে একাকী। চা নেবে এক ভাঁড়। নিশ্চয় উষার তখন হাসি পাবে। মুখ টিপে টিপে হাসবে সে। হাসি চাপতে ঘনঘন চায়ে চুমুক দেবে। এক সময়ে রমেশদার ফতুয়ার কোণ ধরে তুলে বলবে—রমেশদা, তুমি বুঝি তোমার জামা কাপড়টা একটু কেচে নেবারও সময় পাও না। তবে একটা বিয়ে কর না কেন রমেশদা। তোমার জামা কাপড় কাচবে। রেঁধেবেড়ে তোমার জন্যে পথ চেয়ে অপেক্ষা করবে।

রমেশদা হয়ত তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। বলবে—রাস্তার একটা তুচ্ছ চা-ফেরিঅলার কাছে কে আর বিয়ে বসছে, বল?

উষা তখন বলবে, বিয়ে করবে একথা বলেই দেখ না, তখন দেখি এমন ভাল লোকটিকে কে বিয়ে করতে রাজি হয় না।

রমেশদা হয়ত কিছুতেই বলতে চাইবে না। অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলবে, এই নিয়ে ঠাট্টা করে গরীব মানুষকে আর দুঃখ দিচ্ছ কেন?

উষা তখন বলবে, ঠাট্টার কথা নিয়ে দুঃখ পাবে কেন রমেশদা, ঠাট্টাকে ঠাট্টা ভেবেই বল না কেন যে, হ্যাঁ, কনে দেখ আমি বিয়ে করব।

রমেশদা তখন হয়ত উষার মতলব কী জানবার জন্যে বলবে, বেশ তবে বলছি, আমি বিয়ে করব। কনে দেখ।

'তাই যাচ্ছি, কনে দেখতে যাচ্ছি।' বলে উষা উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু শুধু হাতে উঠবে না। কলসির শিকেটা হাতে ঝুলিয়ে নেবে। হাঁক দেবে চা-ই-ই অব্রাক চা-া-া। রমেশদা তখন হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে। উষাও ছুটবে। দু'চার পা'র বেশি যেতে পারবে না।

তার আগেই রমেশদা তাকে ধরে ফেলবে। উষা তখন বসে পড়বে। বলবে, যাকগে ধরেই যখন ফেলেছ তখন আর পালাই কি করে। আমি ধরা দিলাম। যে-হাত তুমি আমার একবার ধরেছ রমেশদা, সে-হাত আর ছেড় না। আমাকে তুমি রক্ষা কর, আমাকে তুমি আশ্রয় দাও, আমি আর পারছি না। আমি মরে যাচ্ছি।

সিনেমার ছবির মত সুন্দর স্বপ্নটা দেখতে দেখতে আবেগে উষার চোখ জুড়ে জল এসেছিল, ভাগ্যিস বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির কণা চোখের জলের মতই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল চোখে মুখে, নয়ত এক বাস লোক তাকে কাঁদতে দেখে কি ভাবত, বৃষ্টির জল মুছে ফেলার ভান করে উষা চোখের জল মুছে ফেলেছিল। কিন্তু অদ্রাক চা বিক্রির সেই কল্পনার ছবিটি মুছে যায়নি চোখ থেকে। কলসি হাতে নিজের সেই ছবিটি মনের মধ্যে দেখতে দেখতে উষা ভেবেছিল সেও চা বেচবে তখন তার সঙ্গে। নয়ত সে বেচবে চা, উষা বেচবে পান। সন্ধ্যার থেকে শেষ বাসের সময় পর্যন্ত সে আর উষা চা আর পান বেচবে। উষা দিনে বেচবে লজেন্স। ট্রাম গুমটিতে কোন মেয়ে ফেরিঅলা নেই। ফেরিঅলা-মেয়ে সে কোথাও দেখেনি। বুঝি নেই। না থাক সে-ই প্রথম মেয়ে-ফেরিঅলা হবে। রাতে রাস্তায় নেমে মান বেচার থেকে দিনে পান লজেন্স বেচা অনেক সম্মানের। তারপর একদিন যখন সে আর ওর সঙ্গে ফেরি করে বেড়াতে পারবে না তখন ঘরে বসে ছোট ছোট কাঁথা বুনবে। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত ছলাৎ করে এসে ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে। শিউরে উঠল উষা। অনুভব করল দুখানি কচি কোমল হাতের মত একটি নরম সুন্দর লজ্জা বুকের মধ্যে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপরে আর রমেশ নয় রমেশকে ছাড়িয়ে আর এক স্বপ্নে ডুবে গিয়েছিল উষা।

কখন যে সে বাস থেকে নেমেছিল, কখন যে সে পুলের সিঁড়ি

বেয়ে আদি গঙ্গার পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে বাড়ির গলিতে পা দিয়েছিল কিছু তার মনে ছিল না। গলির শেষে কাঠ টিন দাপনা মাটির একটা মস্ত স্তূপের সামনে এসে পথ হারিয়ে চমক ভাঙল তার। ভাবল, এ কোথায় এল সে! ভুল করে কোন্ গলিতে ঢুকল! মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই হাঁ-হয়ে-যাওয়া মুখে হাত চাপা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। একটা মধুর স্বপ্নের হাতে হাত রেখে ঘুমের মধ্যে যেন পথ চলছিল উষা, সহসা যেন সেই স্বপ্নটাই একটা বীভৎস মূর্তি হয়ে মুখ খিঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তার সামনে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। বুক দুরদুর করতে লাগল।

'মা, মা উষাদি এসেছে।'

ষষ্ঠীমাসির মেয়ে শান্তি।

কী বলবে ও, ওরা! উষার শরীরটা যেন হিম হয়ে আসছিল।

শান্তি এসে সান্ত্বনা দিল। 'আমাদের বাড়ির ত এই টুকুন। তোমাদের ঘর আর শশীদের ঘর। গোষ্ঠদের বস্তি দেখ গে। গোটা বস্তি মুখ থুবড়ে পড়েছে। কী ঝড়! কী ঝড়! তুমি যদি দেখতে উষাদি! উঃ!'

'আমার মা?' অস্ফুট গলায় বলল উষা। নিরক্ত মুখে তাকাল।

শান্তির ডাকে ষষ্ঠীমাসি রেরিয়ে এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল। বলল, তোমার মায়ের কোন চোট লাগেনি। ভগবান বাঁচিয়েছেন পটল পাঁজা কোলে করে তাকে আমাদের রান্না ঘরে এনে রেখেছে। তবে খুব ভিজেছে, এখন ঠাকুর করেন, জ্বরটর না হয়।'

থ

তবু, ষষ্ঠীমাসির সে আশঙ্কাই সত্যি হয়েছিল, ঠাকুর কিছু করলেন না, মায়ের জ্বর এল। সারা রাত শীতে কেঁপেছিল মা। উষা সন্তানের মত করে মাকে বুকের মধ্যে সারারাত চেপে রেখেছিল। নিজের দেহের উত্তাপে উষ্ণ করতে চেয়েছিল মাকে। উষা পারেনি। তার দেহের সামান্য তাপে মায়ের শীত দূর হয়নি। হল জ্বর এসে। প্রথম উষা ভেবেছিল, তার গায়ের তাপেই বুঝি মায়ের গা গরম হয়েছে; শেষে যখন দেখল মায়ের গা কেবলই গরম হচ্ছে, তখন বুঝল মায়ের জ্বর এসেছে। জ্বর ক্রমশই বাড়ছিল। শেষ রাতে জ্বরের তাপ এত বাড়ল যে উষার মনে হল সন্থ ধরানো কয়লার উনুনকেও বুঝি সে হার মানাবে।

ঘরের নিচে চাপা পড়ে তার অথর্ব মা বুঝি মরে গেছে, ভেবে বাড়ির ভগ্নস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এখন আর একবার উষার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। কোমর ভেঙে শয্যাশায়ী তার দুর্বল মা এই জ্বরে আর বাঁচবে না। যে মাকে সে মনে করত তার পায়ের বেড়ি; মনে করত, যাকে বাঁচানোর জন্যেই তাকে রাতের পথে মান বেচে উপার্জন করতে হয়, যার গলা টিপে মেরে এই নোংরা জীবনের নরক থেকে সে মুক্তি পাবে বলে মাঝে মাঝে সংকল্প করত, আজ সে স্বেচ্ছায় তাকে মুক্তি দিতে চলেছে। উষা ভাবল, এই মা মরে গেলে, তার এই পায়ের বেড়ি ঘাড়ের বোঝা নেমে গেলে সে কি মুক্তি পাবে? মায়ের মূর্ছাগত জ্বর-তপ্ত থমথমে মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল উষা। না না না তার মুক্তি নেই। সে মুক্তি পাবে না। তাকে কেউ রক্ষা করবে না। বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধার আগুনে পুড়ে পুড়ে তাকে খাক হয়ে মরতে হবে। এই পোড়া উদরের জ্বালায় যারই দরজায় গিয়ে

একটু সম্মানের আশ্রয় চাইবে, নিরাশ্রয় যুবতী বলে সে-ই লোভের হাত বাড়াবে ; সে-কঠিন হাতের বেড়ি থেকে রক্ষা নেই তার। রক্ষা নেই। ঊষা মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাগো, মা, তোমার এই হতভাগী মেয়ের যে আর কেউ নেই, তোমার থেকে সে আর কে বেশি জানে, তুমি কিন্তু আমাকে ফেলে যেও না। ঠাকুর, ওগো ঠাকুর, আমি মাকে মারতে চাইনি কোনদিন, না না না। তুমি কি আমার অন্তরের কথা জান না ঠাকুর। এই হতভাগ্য অসহায় ছোট্ট মেয়েটাকে দেখবার জন্যে পৃথিবীতে কাউকেই ত তুমি রাখনি ঠাকুর। শেয়াল কুকুরের খাদ্য হয়ে বেঁচে আছি। নিষ্ঠুর, তবু কি তোমার দয়া হবে না। তুমি কি আমার শেষ আশ্রয় এই ভাঙা আশ্রয়টুকুও কেড়ে নেবে। না না ঠাকুর, তুমি অত নিষ্ঠুর নও। তুমি যদি এমন নিষ্ঠুর হবে তবে পৃথিবীতে এত গরীব কাঙাল কেমন করে বেঁচে আছে।

একবার মায়ের বুকে একবার মাটিতে আছাড় খেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল ঊষা। অনেকক্ষণ কাঁদল। কেঁদে কেঁদে বুকটা ওর খুব হাল্কা হল। তখন একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে তার ভাঙা ঘরে গেল ঊষা। দুটো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ঘরের মধ্যে লুকোন ছিল তার। একটাতে রাখত নোট আর একটাতে খুচরো। গিয়ে দেখল তা খোয়া যায়নি। তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। নিঃশব্দে মাটির পাত্র দুটোকে ভাঙল ঊষা। একটাতে নোট পেল সাতাশ টাকার। আর একটার খুচরোগুলি গুনে দেখল ষোল টাকা। মায়ের ওষুধ, তার পথ্য। নিজের জন্যেও যাহোক কিছু ফুটিয়ে নিতে হবে। অথচ সাতাশ আর ষোল এই তার সম্বল। এই সামান্য সম্বল সামনে করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ঊষা। ঘুগরো ব্যাঙ কুকুর প্যাঁচার ডাকে ডাকে রাত গাঢ় হল, গভীর হল, কাবার হয়ে গেল এক সময়ে।

কাবার হয়ে গেল তারপরের দিনটাও। সারাদিন। বাড়িঅলি মাসি লোকজন ডেকে মজুর লাগিয়ে উষার ঘর খাড়া করে দিল। ঘরের বিছানা বালিশ কাপড়-চোপড় সব ভিজে চুবুচুবু হয়েছিল। সেগুলিকে রোদে দিয়ে দিয়ে শুকোল উষা। ভেঙে ছড়িয়ে যে সব জিনিস সারা ঘর হয়েছিল সেগুলির কিছু ফেলে কিছু রেখে, মেজে ঘষে সংসার দুরস্ত করতেই প্রায় পুরো দিনটাই গেছে উষার। বাড়িঅলি মাসি ভাল লোক। উষার জন্যে দুটো রেঁধেছিল। মায়ের দুধ সাগুটা করে দিয়েছে। ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসেছিল পটলদা। পটলদাই গিয়ে আবার ওষুধটাও নিয়ে এসেছে। ডাক্তারের যে সেইটে মনঃপূত হয়নি, উষা তা অনুমান করেছে।

ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করেছে। তারপরেও কিছুক্ষণ বসে রয়েছে। বারে বারে উষার চোখে চোখে তাকাতে চেয়েছে। রোগীর সম্পর্কে বারে বারে উষার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছে। উষা তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। তার জিজ্ঞাসার জবাবও দেয়নি একটা।

মুদির ছেলে রাখাল শা-ও রোগী দেখে গেছে একবার। রোগী দেখে বেরিয়ে যাবার সময় নিচু গলা করে বলে গেছে, সাগু বার্লি মিছরি রোগীর যা লাগে, তোমারও যা দরকার এনো গিয়ে। পয়সা কড়ির জন্যে ভেবো না। বাবা যখন দোকানে থাকবে না তখন, সন্ধ্যের পরে, যেয়ো! উষা তাকেও আমল দেয়নি। রাখালের সব কথা শেষ হবার আগেই সে অন্য কাজে সরে গেছে।

পটলদাকে খুব এড়িয়ে থাকতে পারেনি উষা ; তার রোখটা যেন একটু বেশি। রোগীর সেবায়, ঘর ঠিকঠাক করার কাজে পটলদা

সারাদিন উষার কাছে কাছে রয়েছে। যুবতী বলে রাগী এই ভিজে মেঝেতে শোবে কি করে। কোথা থেকে একটা ভাঙা তক্তপোষও জোগাড় করে দিয়েছে। কিছু টাকাও দিতে চেয়েছিল। উষা নেয়নি। বলেছে, তোমার কাছে এখন থাক পটলদা। দরকার হলে চাইব।

চাইতে হবে না উষা জানে। ওরা জোর করে দেবে। তাকে ঋণী করবে আগে। তারপর কাবলিঅলার মত রক্তচক্ষু করে তাকাবে। মুখে বলবে ঋণ শোধ কর। চোখে বলবে···

লক্ষ্মীর আসনের সামনে পিলসুজের ওপরে মাটির প্রদীপ। প্রদীপের শিখাটা অব্যবস্থিত একটি আত্মার মত জ্বলছিল, কাঁপছিল, নিবু নিবু হচ্ছিল। আর এক কোণে একটা লালচে হলুদ স্থির আলো জ্বলছিল। লণ্ঠনের আলো। বেদনাবিরহিত আর একটি আত্মা যেন।

লণ্ঠনের পলতেটাকে উষাই অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারটাই ভাল লাগছিল উষার। অন্ধকার ঘরটায় দুফোঁটা আলোর বিন্দুর মত উষার চোখ দুটিও জ্বলছিল। উষা দ্বিখণ্ডিত সত্তা নিয়ে অন্ধকারে তাকিয়েছিল। তার অস্থির এক চোখে এক খণ্ডিত সত্তা জীবনের যন্ত্রণায় কাঁদছে। আর এক চোখে নির্বিকার আর এক সত্তা জীবনের সে যন্ত্রণা খুঁটে খুঁটে দেখছে।

সারাদিন পরে নিজেকে নিয়ে এই একটু বসেছিল উষা। সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবার অনেক পরে। ওদের ভাত হল তবে সাগু জ্বাল দিয়ে নিয়ে এল উষা। সাগুটা জুড়োবার অপেক্ষায় একটু বসেছিল উষা। আর সেই একটু অবসরের সুযোগে কতগুলি চিন্তা সদ্য পাখা গজান উইয়ের মত মাথায় ঢুকে ফর্‌ফর্ করছিল, আর কতগুলি শিকারী বেড়ালের মত ওৎ পেতে বসে এক চোখে চুপ করে তাকিয়েছিল।

উষা এক মনে নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে।

হঠাৎ তলোয়ারের ফলার মতন একটা তীক্ষ্ণ আলো দরজা গলে ঘরের মেঝেয় পড়ে বিঁধে রইল। মুহূর্তকাল। তারপর সেটা ঘরের অন্ধকার খুঁড়ে খুঁড়ে এপাশে ওপাশে ঘুরতে লাগল।

ভয়ানক ভয় পেল উষা। আঁচলটাকে বুকে চেপে একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠে দাঁড়াল।

'ঘরে কেউ নেই নাকি! উঃ, কী ঘুট্ঘুটে অন্ধকার!' ফিস্ফিস্ গলায় কে স্বগতোক্তি করল।

গলার স্বর শুনে চোখ জ্বলে উঠল উষার। গা রি রি করে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষল উষা। কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে শুধু হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের পল্‌তেটাকে উস্কে দিল।

টর্চের আলোটা উষার মুখের ওপরে এক মুহূর্ত থেমে নিভে গেল। অন্ধকারের আত্মা আবিষ্কার করে যেন স্বস্তি পেল মানুষটি।

'যাক, তুমি আছ।'

'আপনি আবার এখন এলেন কেন ডাক্তারবাবু?'

একটা সাপের শিসের মত হিস্হিস্ শব্দ করে হেসে উঠল ডাক্তার। রোগীর শিয়রে উঠে বসল সে।

'তোমার মায়ের এমন শক্ত অসুখ, আমি না এসে পারি? কোথায় কি চাকরি নিয়ে আমাকে বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলে। তাই বলে তোমার প্রতি আমার মনের স্নেহ ত মরেনি!'

ডাক্তার হাত বাড়িয়ে খপ করে উষার একটা হাত ধরে ফেলল।

উষা প্রাণপণ জোরে টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে সে। কিন্তু শান্ত গলায় বলল, 'এটা ভাড়া বাড়ি। এখানে অনেক লোক।'

'তবে আমার ওখানে চল।'

উষার ইচ্ছে হল একটা কিছু তুলে ডাক্তারের মাথায় মেরে বসে। অথবা তার গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু সে সব কিছু না করে সে ছুটে বেরিয়ে এল।

'মাসি মাসি!'

উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল উষা।

অস্থির হয়ে বেরিয়ে এল বাড়িঅলি, তার মেয়ে শান্তি। আরও দু একজন ভাড়াটে ছুটে এল। উষার গলার স্বরে এমন একটা ত্রাস ছিল যে সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছে।

'কী, কীরে!'

সকলে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

'আবার ডাক্তারবাবু এসেছেন। মা নাকি বাঁচবে না।'

বাড়িঅলি সবাইর আগে ঘরে ঢুকল। ডাক্তার তখন কানে যন্ত্র লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করছে রোগীর। সকলে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কানের থেকে যন্ত্র খুলে নিতে নিতে বলল, 'ডবল নিয়ুমোনিয়া। পটল বাবুকে বলেই দিয়েছিলাম, আমি আর একবার আসব। যে ভয়ে বলেছিলাম তাই ঘটেছে দেখলাম। দুটো বুকই ধরেছে। ও ওষুধটা চলবে না। নতুন ওষুধ দিতে হবে।' উষাকে বলল, 'তুমি এখনই এস একবার আমার ডিসপেনসারীতে।' বলে ডাক্তার তার ব্যাগ তুলে নিল। দরজার কাছে এসে আবার ফিরে দাঁড়াল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পটলবাবু অনেক বলল কিনা, তাইতেই ভেবে দেখলাম না আসা অন্যায় হবে। সংসারে এইত ওর একমাত্র নোঙর। এ নোঙর যদি ছেঁড়ে তবে ও যে ভেসে যাবে। আমার আর কি সাধ্য। ভগবানের ইচ্ছা সব। আমি ক্ষুদ্র মানুষ। যতটুকু পারি করব।' থামল ডাক্তার। ও তখনই আবার বলল, 'হ্যাঁ ওষুধটা নিতে আসতে যেন বেশি দেরী করো না উষা।'

ডাক্তারের অধৈর্য ইচ্ছাটার যেন তর সইছে না। মনে মনে ম্লান একটু হাসল উষা।

এমন দয়ালু ডাক্তার হয় না। মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সকলে। লক্ষ্মীর মা অভিভূত কণ্ঠে বলল, 'যথার্থ বলেছেন ডাক্তারবাবু। ওর মা কি দারুণ আছাড় খেল সিঁড়ি থেকে পড়ে, আপনার দয়াতেই বেঁচে গেল সেবার। এবারও আপনি অনুগ্রহ না করলে রক্ষে নেই। সত্যি ভেসে যাবে।'

'কিন্তু এই রাতে উষা যাবে কি করে ওষুধ আনতে?' দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল বাড়িঅলি।

'বাড়িতে এখন পুরুষ কে আছে যে পাঠাবে? যাক না উষা।' বাড়িঅলির দুশ্চিন্তা তুচ্ছ করে বলে উঠল লক্ষ্মীর মা, 'এখান থেকে এখানে। চাকরি করে রাত এগারটা সাড়ে এগারটায় বাড়ি ফিরতে পারে আর এখান থেকে এখানে রাত আটটায় যেতে পারবে না, কি যে বল তুমি শান্তির মা।' উষার দিকে ফিরে বলল, 'উষা তুমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই যাও এখন। আমরাই কেউ রোগীর কাছে বসব'খন।'

'মাকে বার্লিটা খাইয়ে যাচ্ছি, একটু বাদেই আমি আসছি ডাক্তারবাবু', মৃদু গলায় বলল উষা।

'এস। ওষুধটা ততক্ষণ আমি তৈরি করিগে। কম্পাউণ্ডারটা আবার বাড়ি চলে গেছে।'

উষাকে যেন সে আর একটা বিশেষ খবর দিচ্ছে এমন গলায় স্বগতোক্তি করতে করতে বেরিয়ে গেল ডাক্তার। ডাক্তারের সঙ্গে একে একে সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। উষা এসে তক্তপোষের এক কোণে চুপ করে বসল।

মায়ের যখন কোমরের হাড় ভাঙল তখন সত্যিই খুব উপকার করেছে এই ডাক্তার। নিজের গাড়ি করে বাঙড় হাসপাতালে নিয়ে

গেছে। প্লাস্টার করিয়ে আবার বাড়ি নিয়ে এসেছে। নতুন প্লাস্টার লাগানর জন্যে আবার নিয়ে গেছে, নিয়ে এসেছে ; তিন মাস ধরে এই করেছে। দিনে দুবার এসে দেখে গেছে। তাছাড়া নিজের ডিসপেনসারী থেকে বিনি পয়সায় ওষুধ দিয়েছে। সবাই জানে ডাক্তারের সেই নিঃস্বার্থ সেবার জন্যেই তার মা সে যাত্রায় মরেনি। শুধু উষা জানে, কোন্ স্বার্থে সেই নিঃস্বার্থ সেবা করেছিল ডাক্তার।

ডাক্তার নিজে কিছু বলেনি। বলেছে তার কম্পাউণ্ডার।

'উষা, মাকে যদি বাঁচাতে চাও তবে সন্ধ্যের পরে ডাক্তারের কাছে এসে একটু বসবে। লোকটা যে এত করছে তোমার জন্যে, তোমারও ত একটু কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত। গল্পটল্প করবে। যা বলবে তাতে আপত্তি করো না। কিছু ভয় নেই। ডাক্তাররা কোন মেয়েকে কোন দিন বিপদে ফেলে না। তারা বিপদতারণ।'

'মধুসূদন, মধুসূদন!' বলে উঠে গেছে কম্পাউণ্ডার। ডিসপেনসারীর এক কোণে এক টুলে বসে শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছে উষা।

উষা কেঁপেছে। উষা কেঁদেছে। দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করেছে উষা। ডাক্তার তাকে তবু ছাড়েনি। মায়ের চিকিৎসার মাশুল আদায় করেছে। ওই মুদির ছেলে রাখালও এমনি করে বকেয়া আদায় করেছে। ওর কম্পাউণ্ডার ছিল না। ও নিজেই বলেছে। 'মুদিখানায় চাল ডাল তেল নুনে তোমার শ'খানেক টাকার ঋণ শোধ হয়ে যাবে উষা, ছ'টার শোতে যদি আজ তুমি আমার সঙ্গে সিনেমায় যাও।' ডাক্তারের পরে মুদি। উষার তাই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়নি। আরও বুঝেছিল। রাজী হলে চাল ডাল তেল নুনটুকু জুটবে। রাজী না হলে বকেয়া টাকার জন্যে বর্তমানে অনেক দুর্ভোগ। ভবিষ্যতে অনেক উপোস। আর একমুঠো চাল ধারে বেচবে না মুদি। অনন্যোপায় উষা আত্মসমর্পণ করেছে। একদিনের নামে অনেকদিন।

তখনকার একদিন্ কমলার সঙ্গে আলাপ। ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে। চালাক মেয়ে কেমন করে বুঝে ফেলেছিল ব্যাপারটা। কিংবা ডাক্তারকে বুঝি সে জানত। ডাক্তার কী তাকেও ফাঁদে ফেলেছিল? কি জানি। উষা কখনো জিজ্ঞেস করেনি। কমলা খুঁটে খুঁটে তার থেকে সব জেনে নিয়ে বলেছিল, 'ডাক্তার আর মুদির কাছে বাঁধা পড়ে আছো, তুমি ত বোকা কম নও। কাপড় জামা লাগে, মাছ দুধ লাগে, এ সব কী ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে পাওয়া যায়, না মুদিখানায় থাকে! অথচ তোমার থেকে ওরা যা নিচ্ছে তার দামে তুমি রীতিমত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পার। একটু বুদ্ধি ব্যয় করতে পারলে বাড়িগাড়িও হয়।'

সমৃদ্ধির সেই পথের ইঙ্গিত শুধু নয়, সেই পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিল কমলা উষাকে। কমলার পথের পথিক হল উষা। পাড়ায় প্রচার করে দিল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিয়ুর এক রেস্টুরেণ্টে সে চাকরি করে। কে বিশ্বাস করল, কে করল না, জানে না উষা; কিন্তু জানে, নির্বিবাদে এ-বস্তি এ-পাড়া তা মেনে নিয়েছে। ডাক্তার মুদি তথাপি হাত বাড়িয়েছিল। উষার কর্কশ বাক্যবাণে তারা নিরস্ত হয়েছে। কমলাই বুদ্ধি দিয়েছিল। নিজের পাড়ায় পবিত্র থাকবি। সতী লক্ষ্মীর মত চলবি। ত: না হলে বিপদ। পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়ে তখন গিয়ে বাজারে বসতে হবে।

সেই বাজারেই বুঝি বসতে হবে গিয়ে। উষা শিউরে উঠল। এই নোঙর যদি ছেড়ে তাহলে ভাসতে ভাসতে সে কোথায় কোন্ ভাগাড়ে যাবে সে জানে না। কেউ জানে না। কিন্তু ভাসতে ভাসতে সে যেখানেই যাক যাবে; তাই বলে মায়ের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ডাক্তার তাকে নিমন্ত্রণ করবে, মুদি ডাকবে? সেবা দিয়ে কিনতে চাইবে পটলদা?

এই এক নতুন আপদ এবার জুটেছে। পথে-ঘাটে এতদিন

অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী আর কুৎসিত গান করে তাকে বিরক্ত করেছে। এবার বাড়িতে ঢুকে উপদ্রব করবে। নাছোড়বান্দা চোখে এখনই চাইতে শুরু করেছে। কিন্তু যে যে-চোখেই চাক, উষা আর কারো ক্ষুধার আগুনে কাঠ হয়ে পুড়বে না।

উষা উঠল। মাকে বার্লি খাওয়াল। ওষুধ খাওয়াল। ঠিক করল এই ওষুধই চালিয়ে যাবে আজ রাতে। কাল দিনের বেলা পটলদাকে পাঠাবে ওষুধ আনতে। মায়ের মুখের দিকে তাকাল উষা। নির্জীব পড়ে আছে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পাঁজরা কাঁপছে। ঘুমোচ্ছে। মুখে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন দেখল না উষা। তবে আর এখন ডাক্তারের কাছে যাবে কেন সে। ডাক্তার তাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে। মা ভাল আছে।

শেষ রাতে একটা ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজে চমকে উঠল উষা। কোন জন্তুর গলা টিপে ধরলে সে যেমন শব্দ করে সেই শব্দ। চোখ ছুটো কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নাক ফুলছে থেকে থেকে। সেই ভীষণ দৃশ্যে ভয়ানক ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল উষা।

বাড়ির লোকজন ছুটোছুটি করে এসে বিছানার পাশে জড় হল। তাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে উষার মা তার বিস্ফারিত চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ করল। গলার আওয়াজটাও ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকল। শেষে থেমে গেল একেবারে।

'মা, মা, মাগো' আর্দ্র আর্ত গলায় ডেকে উঠল উষা। এক মুহূর্ত। তারপর মায়ের নিস্পন্দ বুকের ওপরে এলিয়ে পড়ল।

ঘ

সন্ধ্যা বয়ে গেছে। তখন।

কে যেন সদরে দাঁড়িয়ে কাকে জিজ্ঞেস করছে। ষষ্ঠীর মার বাড়ি কোনটে?

'কেগা তুমি?' ষষ্ঠী বাড়িঅলি বেরিয়ে এল। 'এটাই ষষ্ঠীর মার বাড়ি। তুমি কাকে খুঁজছ? উষা? হাঁ, এ বাড়িতেই থাকে। তুমি কে? কি? উষার রমেশদা? কে আবার রমেশদা! কেমন দাদা জানিনে বাপু, কোনদিন ত দেখিনি। এলেই যদি, আর একদিন আগে এলে না কেন? হতভাগীর মা'টাকে দেখতে পেতে। আজ শেষ রাতে মায়ের মুখাগ্নি করে বাছা সেই যে এসে ঘরে খিল দিয়েছে আর বেরোয়নি। কত ডাকাডাকি করেছি। সারাদিন শুধু ডাকছি। সাড়া নেই। একটা কান্নার শব্দ পর্যন্ত না। এক ফোঁটা কাঁদল না মেয়েটা। শোকে পাথর হয়ে গেছে। একলা ঘরে এখন, এমন সময়ে, ওকে থাকতে দিই কি করে! যদি এমন তেমন করে বসে লোকে বলবে কি? আমার পরাণটাই কি কাঁদছে না। এক ফোঁটা জল গেলাতে পারলাম না। দাঁতে একগাছি কুটো কাটল না সারাদিনে।'

'উষা ও উষা।' দরজা থাবড়াতে লাগল বাড়িঅলি। 'মা ওঠ। দেখ কে এসেছে। তোর রমেশদা এসেছে, দেখ।'

'রমেশদা!'

ঝড়ের ঝাপটায় দিশেহারা একটা গাঙচিলের গলার চিৎকার যেন শুনল রমেশ।

খট্ করে উঠল দরজা। পাল্লা দুটো পাখির ডানার মত হাট

খুলে গেল। আলুথালু বেশে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল উষা। রমেশের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সারাদিন পরে এইবার উষা ব্যাকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। রমেশের বুকের উত্তাপে উষার তুষার শোক কান্না হয়ে গলে যেতে লাগল।

কেঁদেও যে এত সুখ জীবনে উষা এই প্রথম জানল।

'বাঁচল মেয়েটা।' বলে হাঁপ ছাড়ল বাড়িঅলি।

পাঁচ

যেন কত সুখ কুড়িয়ে কুড়িয়ে বুক ভরেছে উষা। তারই আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে হুচোখের তারায় তারায় ঝিকিয়ে ওঠে, হুচোখের কোলে কোলে ছলছলায়।

খ

উষার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। তার স্বপ্ন সত্য হয়েছে। উষার কিন্তু কিছুতে বিশ্বাস হয় না। সে ভাবে, এ কী সত্য, না সে স্বপ্ন দেখছে। তার জীবন এই পৃথিবী—সব বুঝি স্বপ্ন। স্বপ্নে ছাড়া এত সুখ!

সুখ! কথাটা কানের মধ্যে তক্ষুনি ভয় হয়ে বেজে ওঠে। ধক্ করে ওঠে বুক। মনকে সমঝায় একথা উচ্চারণ করতে নেই। না। হুরুহুরু বুকে বলে, 'মাগো, মা, অপরাধ নিও না। সুখ নয়, এ সুখ না। তোমার আশীর্বাদ।' হাত খুব জোড়া থাকলে উঠতে পারে না উষা। মনে মনে প্রণাম করে। কিন্তু হাত জোড়া না থাকলে ছুটে আসে। গলায় আঁচল দিয়ে লক্ষ্মীর আসনের সামনে উবুড় হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ উবুড় হয়ে থাকে। প্রার্থনা যেন তার শেষ হতে চায় না।

গ

কালীঘাটে বিয়ে হয়েছে তাদের। সমারোহ কিছু হয়নি। সমারোহ চায়ও নি ঊষা। চাইলেই বা পেত কোথায়, কে তার বিয়েতে রোশনচৌকি বসাত। কেবল দেখেছে অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি না থাকে। খুব ভোরে উঠে কালীঘাট গেছে। সকলের আগের কাজ গঙ্গাস্নান। সব আগে দুজনে গঙ্গাস্নান করেছে। ঊষা এক একবার ডুব দিয়েছে আর বলেছে, 'মাগো, মা গঙ্গা, তোমার নাম নাকি পতিতপাবনী। সকলের পাপ ধুয়ে মুছে তুমি পবিত্র কর। আমারও সব পাপ তুমি ধুয়ে নাও। আমাকেও পবিত্র কর।' বলতে বলতে কান্না পেয়েছে ঊষার। কাঁদতে কাঁদতে ডুব দিয়েছে।

ডুব দিয়ে উঠে মনে হয়েছে সত্যি তার সর্বাঙ্গ মন হাল্‌কা হয়ে গেছে। মা গঙ্গা তার দেহের সব পাপ ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আগের দিন বিকেলে একখানি লাল পাড় সাড়ি কিনিয়ে রেখেছিল সে রমেশকে দিয়ে। এখন সাড়িখানা পরল। নতুন সাড়ি-পরা নিজের দেহ দেখতে দেখতে ঊষা শুধোল, 'কেমন, নতুন দেখাচ্ছে না আমাকে? একেবারে নতুন হয়ে গেছি, না?'

রমেশ ঊষার আগেই স্নান করে উঠে কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়েছিল। এখন তাকিয়ে তাকিয়ে ওর ভিজে সাড়ি ছাড়া, নতুন সাড়ি পরা দেখছিল—যেন ওর এতকালের স্বপ্নটাকে দিনের আলোয় সত্যি করে অনুভব করছিল। ফিক্ করে একটু হেসে বলল, 'হাঁ নতুন বউ, মাথায় আঁচল আর কপালে সিঁদুরটা যা বাকি।'

সাড়ির মস্ত লাল পাড়টার ডগ্‌ডগে রঙ ঊষার ভিজে ভিজে

রোদে লাল ঘামে ভিজে উষার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বলল, 'আজকাল ওসব আর নেই। আজকাল লোকে সবই খায়, ভাতও খায় কেউ কেউ।'

'আজকাল আর ওসব নেই মানে কী? শাস্ত্র নেই? শাস্ত্র উঠে গেছে?' উষার গলা তিরস্কারের মতন হল।

'শাস্ত্র উঠে যাবে কেন, শাস্ত্র আছে।' একটা ঢোক গিলল পাণ্ডাঠাকুর। ওদের পেশা শাস্ত্রীয় কথা বলা নয়। শাস্ত্র তারা ক'জন জানে, বুঝি কেউ জানে না। ওদের পেশা হল যজমানের মন রেখে কথা বলা। শাস্ত্রের নামে নিজের সুবিধে মত যে যজমান যে ধরনের পাঁতি চায় ওরা তাই দেয়। মনস্তত্ত্বে ওদের একটা অদ্ভুত অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে। মুখ দেখে, হাবভাব, আচার-আচরণ দেখে বলতে পারে কি ধরনের যজমান। কি মতলবে এসেছে। কিন্তু সব সময় যে সে অশিক্ষিত-পটুত্ব কাজে লাগে তা নয়। যেমন এখানে কাজে লাগল না। রমেশের কথা শুনে আর উষার মুখ দেখে পাণ্ডাঠাকুর যা আঁচ করেছিল দেখল তা ঠিক নয়। হিসেবে ভুল হয়েছে তার। ঢোক গিলে, একটু সামলে নিয়ে বলল, 'শাস্ত্রে আছে···'

'কী আছে?' উষা অধৈর্য গলায় শুধোল।

'পারলে নিরম্বু উপবাস।' যেন শোধ নিচ্ছে কোন পরাজয়ের, সেই গলায় বলল পাণ্ডা।

'আমি পারব।'

উষার ঘনবদ্ধ ঠোঁট শিথিল হল। ঠোঁটে হাসি ফুটল উষার।

পাণ্ডাঠাকুর বুঝল। সে বাঁচল। আর মেপে মেপে কথা বলতে হবে না। ভেবে ভেবে এগোতে হবে না এদের কাছে। এদের চেনা গেল। এমন ঢের আসে ওদের কাছে। যার সঙ্গে নির্ভয়ে ঘর ছাড়তে পারে, তার ওপরে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারে না।

তাই মন্ত্র পড়ে গাঁটছড়া বাঁধে, সবটুকু আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে করে। বুঝি ভাবে আচারের সংসার আছাড়েও ভাঙে না। এই মেয়েটিরও সেই ভরসা। যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার ওপরে যত না, তার থেকে আচারের ওপরে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ওপরে বেশি ভরসা। পাণ্ডাঠাকুর মাথা নিচু করে ওদের আনা জিনিসগুলি দেখছিল।

উষা বলল, 'ভাল করে দেখুন ঠাকুরমশায় কিনতে কিছু আরও রইল কিনা।' উষা নিজেই মাটিতে উট্‌কো হয়ে বসল, 'এই যে দেখুন যজ্ঞের কাঠ, যজ্ঞডুমুর না কি বলে এ তাই, এটা—'

ঠাকুর দেখছিল, ফুল মালা, দূর্বা চন্দন চূয়া সোলার মুকুট চূড় তিল হরীতকী—আনতে ভদ্রমহিলা বাকি কিছু রাখেনি।

'দেখবেন, মধু অভাবে গুড় করবেন না যেন। শাস্ত্রের অনুষ্ঠানে যেন কোন ত্রুটি না থাকে।'

সংসার বাঁধবার ওই একমাত্র খুঁটি, ভালবাসার টানে ঘর ছাড়তে পার, বেঘোরে পড়ে খাবি খেতে পার কিন্তু ভালবাসার খুঁটিতে সংসার বাঁধতে পার না। বাড়ি থেকে পালানোর কালে সাক্ষী রাখতে চাও না। কিন্তু মালাবদলের কালে তখন অগ্নি ব্রাহ্মণ মা-কালী সাক্ষী চাই।

মনে মনে হাসল পাণ্ডাঠাকুর, বলল, 'কিছু বাকি আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। তবু দেখছি। আপনারা ওই খোপের ঘরটায় গিয়ে বিশ্রাম করুন।' জিনিসপত্র একদিকে গুছিয়ে রাখতে লাগল সে। একটু পরে মাথা তুলে বলল, যান না। ওদিকে কেউ যায় না। যাবে না।'

পাণ্ডার কথায় কিসের যেন ইঙ্গিত। উষা ভ্রূ কুঁচকোল। বলল, 'না, আমরা এখন মন্দিরে বসব—নাট মন্দিরে।'

হঠাৎ মনে হল, সারাদিন উপোস করে রমেশ কি করবে। শরীর ভাল লাগবে না এক সময়। তখন একটু শুয়ে থাকলে ভাল লাগবে। বলল, 'এখন আমরা মন্দিরে যাচ্ছি পরে ও ঘরে বসব। ঘরটা আর কাউকে দিয়ে দেবেন না যেন।'

পাণ্ডাঠাকুর ঠোঁট টিপে হাসল। জানি জানি, কুঁচকানো ভ্রূর তলায় সব লুকিয়ে রাখা যায় না। বলল, 'রাখব। ও ঘরটা আমরা নতুন বিয়েঅলাদের জন্যেই আলাদা করে রেখেছি। যতক্ষণ খুশি থাকতে দিই। অনেকে দু'চার দিনও থাকে তখন অবশ্য ভাড়ার হারটা অন্য রকম হয়।'

'বিয়ের সময় পর্যন্ত কত? মানে দিনের বেলাটার জন্যে শুধু।'

'কত আর। সামান্য। দু' টাকা।'

তাহলে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের জন্যে রাখবেন।'

ওরা দুজনে বাইরে নেমে এল।

পাণ্ডাঠাকুর মুখ তুলে হাসল। ঘাড় কাৎ করল, 'আচ্ছা।'

মনে মনে বলল—রাতের মত ভাড়া করতে এখন সকালবেলায় লজ্জা করছ কিন্তু সন্ধ্যার পরে আর লজ্জা থাকবে না। তখন আমি আরও তিন টাকা চার্জ করব। তখন তোমরা হাসিমুখে তাই দেবে। এখন একবারে পাঁচটাকা চাইতে আমারও সঙ্কোচ, দিতে তোমাদেরও কষ্ট।

'চল, চা খাবে।' বাইরে এসে উষা বলল।

'কেন, শাস্ত্রে বুঝি বরের জন্যে উপোস লেখেনি?' রমেশ দাঁড়িয়ে থেকে বলল।

'পুরুষের জন্যে শাস্ত্রে অনেক সুবিধা আছে।' উষা রমেশের হাত ধরে টান দিল, 'তাছাড়া, একজনের উপোস করলেই হয়, তুমি বরং ভাত খেও না। চা মিষ্টি খাও। বিকেলের দিকে ডাব খেয়ো, দুধ খেয়ো।'

'তুমিও খাও না। মিষ্টি, চা; পাণ্ডাঠাকুরের কথা ত শুনলে। আজকাল ...'

'অনেকেই খায়। কিন্তু আমি খাব না। আজ আমি সমস্ত দিন না খেয়ে শুধু মা-কালীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করব।'

'ওঃ হো,' যেন শুভ আরম্ভেরই কোথাও গুরুতর একটা দোষ লেগেছে এমনই ভয়ের ভঙ্গী করে উঠল ঊষা।

রমেশের মুখেও আশংকা জাগল।

'কী, হয়েছে কী?'

'গঙ্গাস্নান করে উঠে তোমাকে প্রণাম করা হয়নি, তোমার আশীর্বাদ নেওয়া হয়নি।'

'ও-ও'।

এমন স্বরে উচ্চারণ করল যেন, এর জন্যে তুমি আঁৎকে উঠেছ? বলল রমেশ। অর্থাৎ আমল দিল না সে।

ঊষা তবু থামল না।

'চল মন্দিরে যাই। দুজনে মাকে প্রণাম করি। তারপর তোমাকে প্রণাম করব আমি, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে।'

তাকে আবার প্রণাম করবে কী! সে আবার আশীর্বাদ করবে কী! রমেশের হাসি পেল। সে কী প্রণামের উপযুক্ত নাকি!

'ধ্যাৎ আমি তোমাকে কী আশীর্বাদ করব, আশীর্বাদ করবে পুরোত ঠাকুর।' সংকোচে অসোয়াস্তিতে বিব্রত হয়ে পড়ল রমেশ, বলল, 'তার চেয়ে এস, আমি চা খাই তুমি দেখবে।'

ঊষা খুশি হল। ঊষা বুঝতে পারল এক মন্দির লোকের সামনে ঊষার প্রণাম নিতে, প্রণাম নিতে শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে ওর খুব লজ্জা। সে লজ্জা এড়াতে এমন তাড়াতাড়ি চা খেতে রাজী হয়ে গেল। নয়ত এই চা-খাওয়া নিয়ে

উষাকে যে কী করতে হত ভগবান জানেন। বেশ হয়েছে। উষা মৃদু একটু হাসল।

'বেশ, চল চা খাবে।'

রমেশের সঙ্গে অগ্রসর হল উষা। মনে মনে বলল—এখন কিছু বলব না। খাওয়া হয়ে গেলে বলব। প্রণাম না নিয়ে, আশীর্বাদ না করে, যায় কোথা দেখব।

খাওয়া ত ওই—এককাপ চা, একটা সিঙ্গাড়া একটা মিষ্টি, প্রায় এক ঘণ্টা তাই খেতেই কাটিয়ে দিল রমেশ।

উষা দাম চুকিয়ে দিয়ে এসে বলল, 'এই চাটুকুন খেতে যদি সন্ধ্যে করতে পারতে তাহলেই যেন বাঁচতে, না?'

'সত্যি', অত্যন্ত বিব্রত কণ্ঠ রমেশের, 'এখন কেন, এত মানুষের মধ্যে কেন, শুভ কাজ চুকেবুকে গেলে সেই রাত্তিরে, তখন—'

'তখন ত আছেই। কিন্তু এখনও চাই। আমার শুভদিন তোমার আশীর্বাদ দিয়ে সুরু হবে। একটু দেরী হয়ে গেছে। আর দেরী করব না। এস মন্দিরে যাই। দুজনে মাকে প্রণাম করি। তারপর আমি তোমাকে প্রণাম করব। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে।'

'ওই এক মন্দির লোকের মধ্যে?' যেন ভয় পেয়েছে, চোখ এমনি বড় করল রমেশ। এক-সমুদ্র জলে খাবি খেতে খেতে হঠাৎ যেন পায়ে চড়া ঠেকল তার, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তাহলে দুটাকা দিয়ে যে ঘরটা ভাড়া করলে চল, সেখানে যাই।'

তাকে কে কবে প্রণাম করেছে! সে কবে কাকে আশীর্বাদ করেছে! রাস্তার তুচ্ছ একটা ফেরিঅলাকে কেউ প্রণাম করে নাকি? তার আশীর্বাদও কারও দরকারে লাগে নাকি? তক্ষুনি মনে পড়ল। অন্তত একজন লোকের কাছে সে তুচ্ছ নয় আর। সে তার স্বামী। পূজনীয়। হঠাৎ ফেরিঅলা থেকে এক পূজনীয়

স্বামীতে পদোন্নতি হয়েছে তার। বেশ লাগল ভাবতে। সে প্রভু। চিরকাল সে আদেশ শুনে এসেছে এখন আদেশ করতে পারবে। কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে। খুব লোভে কথাটা ভাবল রমেশ কিন্তু কার্যত সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারল না।

উষার চোখ কৌতুকে কৌতূহলে কাঁপছিল। একটা প্রণাম নেবে তাতে মানুষটির কি লজ্জা কি সংকোচ। হেসে বলল, 'তাই চল।'

দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে রমেশ এসে তক্তপোষে বসল, কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'আমাকে প্রণাম না করলে কী যে হয়।'

উষা ততক্ষণে রমেশের ঝুলোন দুপায়ে মাথা রেখেছে। বলল, 'এবার আশীর্বাদ কর।'

ভারি একটা অস্বস্তিবোধ বড় বিব্রত করে ফেলল তাকে। সে তাড়াতাড়ি উষাকে তুলল দুহাতে, বলল, (কী বলবে, কী বলা যায়, এ সময় কী বলে লোকে, কে জানে, রমেশ কী জানে?) যা মুখে এল বলল রমেশ, বলল, 'বউ তুমি সুখী হও।' বলতে পেরে রমেশ যেন হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেল। একটি দেহের মনের মালিক হতে পারার অহঙ্কারে বুঝি মাথা তার আকাশে ঠেকল।

একটা অগাধ সুখের আবেগে উষা রমেশের গলা জড়িয়ে ধরল। নিজেকে পুজোর নৈবেদ্যের মতন নিবেদন করে দিতে পারার আনন্দে তার দুচোখে পুকুর-পুকুর জল চিকমিকিয়ে উঠল।

একটা আঙুল দিয়ে দরজায় আস্তে করে ঠেলা দিল পাণ্ডাঠাকুর। দরজা খুলল না। নড়ল না। পাণ্ডাঠাকুর হাসল। সে জানত। শুধু দুটাকা নয় ওদের থেকে আরও পাঁচ টাকা আদায় হবে। আগে ভেবেছিল আরও তিন নেবে। এখন ঠিক করল রাতের জন্যে আরও পাঁচ চার্জ করবে। পাঁচ টাকা শুনে হয়ত দিদি

ভ্রূকুটি করবে কিন্তু ভ্রূকুটি করলে কী হবে দিদি, কিসের টানে ঘর থেকে বাইরে এসেছ সে কী জানিনে। পাঁচ টাকা তার কাছে কিছু না।

লুচি দই মিষ্টি দিয়ে পরিতোষ করে পাণ্ডাঠাকুরকে খাওয়াল ঊষা। তারপর পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে চলে আসবার সময় প্রণাম করে বলল, 'শুভ কাজ সম্পন্ন করিয়ে দিলেন, এবার যাবার সময় আশীর্বাদ করুন যেন সুখী হই।'

তাহলে রাত্রে থাকছে না। তাহলে আরও পাঁচটা টাকা রোজগার হল না তার। লোকসানের শোকে মুখ কালো হয়ে আসছিল জোর করে একটা হাসি টেনে এনে তাকে চাপা দিল পাণ্ডাঠাকুর। কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করে বলল, 'সুখী হবে বই কি দিদি, তুমি সুখী হবে। তোমার মন বড় পবিত্র (কেননা রাতে ঘরে থাকল না), দেব-দ্বিজে তোমার অসীম ভক্তি (কেননা, ঘটা করে পুজো দিয়েছে, মোটা দক্ষিণা দিয়েছে তাকে, পরিতোষ সহকারে খাইয়েছে), মা নিশ্চয় তোমার মঙ্গল করবেন। এগিয়ে দিতে পাণ্ডাঠাকুর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। রাস্তার বাঁকে এসে এবার বিদায় নেবে, বলল, 'এই বুড়ো পাণ্ডাকে যেন ভুলো না দিদি।' ভবিষ্যতের এই ব্যবস্থা করতেই সঙ্গে সঙ্গে আসা।

ঊষা শিউরে উঠে বলল, 'ছি ছি, আপনাকে কেন ভুলে যাবো।' তারপরেই তার মনে পড়ল, দোষীর গলায় বিনীত কণ্ঠে বলল, 'বুঝতে পেরেছি কেন আপনি একথা বলছেন, আপনার অভিমান হয়েছে। আজ সারাটা দিন লক্ষ বার আপনি আমাকে দিদি বলে ডেকেছেন, আর আমি একটিবারও,···সত্যি, আমারও এক সময়ে বড় ইচ্ছে হয়েছিল আপনাকে দাদা, ঠাকুরভাই বলে

ডাকি, কিন্তু পাছে আপনি তাতে অপরাধ নেন এই ভয়ে·· ', উষা আর একবার পাণ্ডাঠাকুরের পায়ের ধূলা নিল, বলল, 'মাকে দর্শন করতে যখনই আসব আপনার ঘরে উঠব ঠাকুরভাই। এবার তবে আসি।'

রমেশের হাত ধরে উষা রাস্তার বাঁক ধরল।

স্তব্ধ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল পাণ্ডাঠাকুর। কাউকে দিদি কাউকে মা এইত তাদের ব্যবসার বুলি। এই মেয়েটিকেও সে দিদি বলে ডেকেছিল। ব্যবসার অতিরিক্ত সে ডাকে আর কিছু ছিল না। এখন মনে পড়ল এই শান্ত নম্র ভক্তিমতী মেয়েটি তার ছোট একটি বোনের মতই সারাটি দিন একটি মিষ্টি ছায়ার মত তার সমস্ত ঘরটি জুড়ে ছিল। ব্যবসা করে করে তার মন যদি এমন বিষয়ী হয়ে না যেত তাহলে সেই স্নিগ্ধ ছায়াটি তার বুকেও কি এসে পড়ত না। কি সুন্দর বলে গেল, ইচ্ছা হয়েছিল দাদা বলি, ঠাকুরভাই বলে ডাকি। হঠাৎ পাণ্ডাঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতের কাছে যে পটের দোকানটা দেখল হাত বাড়িয়ে তার থেকেই একখানা বাঁধান লক্ষ্মীর পট তুলে নিয়ে দৌড় দিল।

সদানন্দ রোডের কাছে এসে ধরল ওদের।

'দিদি!'

চমকে ফিরে তাকাল উষা।

'ঠাকুরভাই!'

'দিদি তোমার গরীব ঠাকুরভাইয়ের আর সামর্থ্য নেই, এই লক্ষ্মীর পটখানি তোমার বিয়েতে আমি যৌতুক দিলাম।'

লক্ষ্মীর পটটি হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজল উষা।

আর্দ্র তৃপ্ত চোখে তাই দেখতে দেখতে পাণ্ডাঠাকুর বলল, 'তুমি সুখী হও।' বলে পাণ্ডাঠাকুর নিজেও খুব সুখী হল। পাণ্ডার মত নয়, এবার দাদার মত আশীর্বাদ করতে পেরেছে সে।

সকলের অন্তরের আশীর্বাদ কুড়িয়ে কুড়িয়েই যেন উষা আজ এমন সুখী। এ সবই পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল ভাবে উষা।

সুখী আজ রমেশও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার দুঃখ ঘুচেছে। তারও সুখের আজ অবধি নেই। সাবি মিনি টুনি বিলুকে নিয়ে তার দুরাশার স্বপ্ন আজ উষার মধ্যে সত্য হয়েছে। উষার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে সেই দুর্লভ স্বপ্নের স্বর্গে ঘুমায় রমেশ। অতৃপ্তির আর এক স্বর্গের স্বপ্নে জাগে। দুহাতের অঞ্জলির মধ্যে উষার মুখ তুলে ধরে। তার বেত-ফল-নীল টলটলে চোখের গভীরে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। দুজনের থরথর এক দুরন্ত ইচ্ছা ঠোঁটে ঠোঁটে এসে মেশে। বুকে বুকে মেশে দুজনে। দুজনে দুজনের বুকের গভীরে ডুবে যায়। ছোট ঘন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অমেয় এক সুখে শিহরায় রমেশ। কানের কাছে মুখ এনে অস্ফুট অধৈর্য গলায় ডাকে—বউ—বউ—বউ···

তার বউ। তার সংসার। সে আজ একজনের প্রভু। তার মতন সুখী আজ কেউ নেই। কেউ না।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

নাভিতেই চোখ পড়ে প্রথমে। ছোট ব্লাউজ নাভির অনেক ওপরে শেষ। আপেলের বোঁটা পড়ে গেলে গর্তের মতন নাভি দেখা যায়। নাভির নিচে ফিকে বেগুনী সাড়িটা কেমন জড়সড়। সেখান থেকে কোঁচার মতন কয়েকটা ভাঁজ হয়ে নেবে নিভাঁজ হয়েছে উরুতে। গোল সুডৌল উরু কলার গর্ভ মোচার মতন। ভেতরে সাদা সায়ার আভাস। চোখ নামে উ... বেয়ে। জানু পেরিয়ে পায়ের ...তা। পায়ের নখ। নখে লাল রঙ। সেখানে স্যাণ্ডেলের সোনালী স্ট্র্যাপ। পরে শাদা সুখতলার রেশ। তার নিচে কাঁকর—বিবর্ণ ইঁটের সরু পথ।

চোখ ওঠে: নাভি পেরিয়ে টিয়া-রঙের ব্লাউজ। সবুজ মিহি আর গাঢ়। ধারাল বুক ঢেকে (বরং চোখকে আরও বেশি করে ডেকে) সাড়ির মিহি জরি-কাজ ভিন্ন-রঙের আঁচল। কোমর আরও ঘন করে জড়িয়ে আঁচলটা ডান দিক বেয়ে বাঁ কাঁধে উঠে গেছে। এখন বুক ঢেকে বাঁ হাতে কনুই অব্‌দি নেমে পিঠে পতাকা ওড়াচ্ছে। মুখ একটু ফেরান বলে কাঁধের কাছে এখন থুতনি। লাল মৌসুমী ফুলের পাপড়ির মতন রঙ করা ছোট ছোট দুটি ঠোঁট। ঠোঁটের ওপরে সরু খাড়া নাক। দু'পাশে কাজল টানা দিঘল পাতার নিচে আধ ঢাকা চোখ। কালো পেন্সিলে আঁকা মোটা থেকে সূক্ষ্ম ভ্রূর রেখা তার ওপরে। সেখান থেকে ছোট কপাল একটি হলদে পাতার মতন। লাল একটি টিপ

মাঝখানে। একটি গোল কাচ পোকা লেপটে বসে আছে যেন। সবার ওপরে ঘন কালো চুল। দুরন্ত হাওয়ায় সামান্য উস্কখুস্ক। চোখের কাছে ফুরফুর করছে এক থোকা।

একহাতে সোনার ঘড়ি, মিনে করা সোনার পাতে বাঁধা। আর একহাতে সরু এক গাছি রুলি। বাঁ হাতের এক আঙুলে পাথর বসান সোনার আঙটি। নখে নখে রঙ। গায়ে একটু মাংস লেগেছে কি লাগেনি ; কিন্তু বোঝা যায় অবস্থা ফিরেছে কমলার। বেশ পয়সা কামাচ্ছে আজকাল।

'এই যে রমেশদা !'

অলক্ষ্যে কখন পাশের থেকে কাঁধে হাত দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কলকলিয়ে হেসে উঠেছিল কমলা। হাসির শব্দ থামলে, তারপরও তা এখন ঠোঁটে লেগে আছে।

ভীষণ চমকে উঠেছিল রমেশ। চোখ বিপন্ন বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠেছিল। বড় বড় চোখ করে তাকে দেখছিল রমেশ। নাভি থেকে পা। নাভি থেকে মাথা। চেনা যায় না। সূক্ষ্ম পাউডার প্রলেপে রুজে এবং সর্বাঙ্গের এক মৃদু সুরভি কুয়াসার মধ্যে অনেক অনেক দূরে কমলা। হাসলে গালে টোল পড়ে, শেষে চোখের তারায় এসে তিরতির করে। এ সেই গাল, সেই চোখ। তবু চেনা যায় না। চিনতে সাহস হয় না।

'কি গো, এত করে দেখছ কী। চিনতে পারছ না?'

রমেশের থুতনি নেড়ে দিল কমলা। কে দেখল না দেখল গ্রাহ্য করল না। এত লোক। বিকেলের রঙিন মিছিল যেন বিশ্রাম করছে পার্কটায়। রমেশ চারধারে তাকিয়ে ঢোক গিলল। কমলা রমেশের চোখে চোখ পেতে আবার হাসল।

রমেশ বলল, 'না, চেনা যায় না। কাল দেখলেও বুঝি আজ চিনতাম না। তাতে ক-ত দিন পরে দেখলাম আজ।'

'কত দিন কী গো ?'

জিজ্ঞেস করে নিজেই মনে মনে হিসেব করল, করে বলল, 'হাঁ, তা প্রায় মাস এগার ত হবেই। কিন্তু কাল দেখলেও আজ চিনতে পারতে না, আমি কি এমনি বদলেছি? এস বসি কোথাও।'

'নিজেকে আয়নায় দেখে বেরোও নি বুঝি ?'

কমলার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল রমেশ।

একটু দূরে এসে নির্জন ঘাসের ওপরে বসতে বসতে কমলা বলল, 'আমাকে বুঝি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ ?'

কমলার মুখোমুখি বসে রমেশ জবাব দিল, 'অপ্সরী !'

একদিন কমলাকে রমেশের বড় ভাল লেগেছিল। বড় লোভ হয়েছিল কমলার জন্যে। তার চোখে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল কমলা। তার মনকে মাতাল করে দিয়েছিল। কিন্তু সে নেশার রঙ চোখ থেকে অল্পদিন পরেই মুছে গিয়েছিল। মনের মাতলামিটাও কেটে গিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই। কেন গিয়েছিল কমলার দিকে তাকিয়ে এখন বুঝল রমেশ। সেদিন মেয়েমানুষের প্রতি তার ছিল একটা অজানা কৌতূহল। অনভিজ্ঞ লোভ। উষাকে বিয়ে করে মেয়েমানুষের শরীরের স্বাদ জেনেছে রমেশ। এ স্বাদ যদি তার সেদিন জানা থাকত তবে সাধ্য ছিল না কমলার অমন করে আঁচল উড়িয়ে রমেশকে উপেক্ষা করে যাবার। সে দিনের সে অনভিজ্ঞতার জন্যে আজ রমেশের বড় দুঃখ হল। কমলাকে ভোগ করবার মস্ত সুযোগ হারিয়েছে বলে আপসোস হল তার।

কমলা রমেশের চোখের ভেতরে চোখ রেখে বলল, 'রমেশদা, 'তোমাকেও চুমু খেতে ইচ্ছে করে আমার।'

রমেশেরও কী কমলাকে চুমু খেতে ইচ্ছে করে না? পাকা কাশ্মীরী আপেলের মতন কমলার রঙ করা মুখ নাকের সামনে

দেখতে দেখতে রমেশ ভাবে তারও ইচ্ছে করে চুমু খেতে, চুমু থেকে শুরু করে ওর সমস্ত শরীরটাকে নিংড়ে নিংড়ে রস করে খেতে। একটা অশেষ আশ্লেষের পিপাসায় মনটাকে অবুঝ মনে হয়। রমেশ বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে কমলার দিকে। শোনে।

কমলা বলছে, 'এ এগার মাসে তুমি আরও সুন্দর হয়েছ। সেই রুক্ষ খসখসে ভাবটা গেছে। তোমার জৌলুস বেড়েছে। ফতুয়ার বদলে হাফসার্ট দেখছি। খাটো মোটা ধুতির বদলে ফাইন লঙক্লথের পরিষ্কার পায়জামা। পায়ে চক্‌চকে স্যাণ্ডেল। ব্যাকব্রাস চুল। বেশ পয়সা কামাচ্ছ বল ?'

রমেশ ভাবল, এর পরেই উষার কথা পাড়বে কমলা। উষার দালালি করেই এই পয়সা কিনা শুধোবে। একজনের দালালি কী আর করছ; দালালির স্বাদ যখন পেয়েছ, আরও মেয়ের দালালি করছ। তাদের নাম বল। কাছে পিঠে থাকলে তাদের দেখাও।

রমেশ অস্বস্তিবোধ করল। আর কারও কথা জানতে না চাক্ উষার কথা জানতে চাইবে। দু' বন্ধু। এক বন্ধু অবস্থা ফিরিয়েছে। আর এক বন্ধু কী হালে আছে। তার অবস্থা ফিরেছে কিনা, জানতে চাইবে। রমেশ কি বলবে উষার কথা ?

রমেশ কমলাকে দেখতে লাগল। কমলা একদিন তাকে বলেছিল, 'রমেশদা তোমাকে বিয়ে করতে আমার লোভ হয়।' আজ বলল, 'রমেশদা, তোমাকে আমার চুমু খেতে ইচ্ছে করে।'

কমলার চোখে ইশারা। কমলাকে এখন রমেশ হাত বাড়ালে পাবে। কমলা কী তাই বলছে না ? দু' বন্ধুর একজনকে সে বউ করে পেয়েছে। আর একজনকে বুঝি আজ ফাউ করে পেতে যাচ্ছে। এখন সে যদি জানে রমেশ উষাকে বিয়ে করেছে তখন, তখনও কি কমলার চোখে এই নেশা, রমেশের হবার এই

আগ্রহ থাকবে? কিন্তু এখনই কী এ নেশা আছে? এ তার ঠাট্টা-তামাসাও ত হতে পারে। রসিকতা। হোক। তবু সে উষার কথা বলবে না। উষাও কমলার কথা জানতে চায় না। এত দিনে একদিনও কমলার নাম উচ্চারণ করেনি উষা। পার্কে ময়দানে কমলার সঙ্গে দেখা হয় কিনা জানতে চায়নি।

বিয়ের দু'দিন পরেই লক্ষ্য করেছিল রমেশ। উষা একে ওকে বলছে। যেখানে সন্ধান পাচ্ছে ছুটে যাচ্ছে।

'কী ব্যাপার?'

'না, একটা বাসা খুঁজছি।'

'কেন এখানেই ত বেশ আছি। ষষ্ঠীমাসির বাড়িটা এত কী খারাপ!'

'উঁহু, এখানে থাকব না।'

তারপর কী বলতে গিয়ে চেপে গেছে উষা। তার উন্মুখ মৌন মুখের দিকে তাকিয়ে রমেশের সন্দেহ হয়েছে, কমলার সঙ্গে আর পাছে তার দেখা হয় সে-ভয়ে এ-পাড়া, এ-তল্লাটই ছেড়ে পালাতে চাইছে উষা।

বিয়ের দিন। বিয়ে করে ফিরে এসে রমেশ বলেছিল।

'আজ যদি কমলা থাকত তবে কতবার শাঁখ বাজাত, কতবার উলু দিত। হেসে নেচে কি কাণ্ডই না করত। কোথায় যে গেল!'

সে কথা শুনে উষার চোখ ঝিকিয়ে উঠেছিল।

'মরুক গে যেখানে খুশী! আজকের দিনে আর ওর নাম করো না।'

কেন উষার চোখ ঝিকিয়ে উঠেছিল, কেন উষা সেকথা বলেছিল? এখন মনে হল, কমলা রমেশকে ভালবাসে এইটে জেনেই বুঝি ঈর্ষা ছিল উষার মনে কিংবা বুঝি ওর ধর্মের সংসারে পাছে

কমলার মত অলক্ষ্মী মেয়ের ছায়া পড়ে সেই ভয়ে সে অমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল বাড়ি বদলের জন্যে।

কমলার নাম করবার তাগিদ সেদিন রমেশের মনেও ছিল না। রমেশ আর কিছু বলেনি। ভুলেও গিয়েছিল। কিন্তু উষা ভোলেনি। সাত দিনের মধ্যেই সে দুর্গাপুরের পুলের তলায় বস্তিতে একখানা ঘর পেয়ে গেল। নতুন বাসায় উঠে এসে হাঁপ ছেড়ে উষা বলেছিল, 'বাব্বা, বাঁচলাম।'

রমেশ রসিকতা করে বলেছিল, 'কী, কমলা তোমাকে তাড়া করছিল নাকি? পালিয়ে বাঁচলে?'

'ধ্যাৎ, কমলির ভয়ে বাড়ি বদলাতে যাব কেন? দেখছ না ঘরের দোরে গঙ্গা। রোজ সকালে উঠে গঙ্গাস্নান করব। একটু হেঁটে কালীঘাট। নিত্য মাকে দর্শন করব।'

রমেশ তার কাঁধের দুই প্রান্ত মুঠোয় ধরে বলেছিল, নিত্য মাকে দর্শন করবে ভালই কিন্তু নিত্য গঙ্গাস্নান করলে এই সোনার অঙ্গ যে মাটি হয়ে যাবে।'

'ফুঃ সোনার অঙ্গ না ছাই!'

রমেশের চোখে চেয়ে সুখে হেসেছিল উষা। সে হাসি একখণ্ড রুপোলী চাঁদের প্রতিবিম্ব হয়ে ছলছল করছিল উষার চোখে। এখন সেই চোখ মনে করে রমেশ শক্ত হল। স্থির করল কমলাকে উষার কথা বলবে না। বললে এখনই হয়ত ছুটবে কমলা। কপালে সিঁদুর ঘোমটা-পরা উষাকে দেখতে কেমন, দেখতে ছুটবে। কমলার ঐশ্বর্য দেখে উষার যদি তখন লোভ হয়। তার এত দিনের তৈরি করা মানিয়ে নেওয়ার মন যদি পাল্‌টে যায়। তার মত গরীবের বউ হয়ে আর যদি সে থাকতে রাজী না হয়। অথবা উষার দারিদ্র্য দেখে কমলাই হয়ত তখন লোভ দেখিয়ে আবার তাকে পথে নামিয়ে নিয়ে আসবে। কমলা আকাশের চাঁদ,

আকাশে থাক। খোলার ঘরের মাটির প্রদীপ উষাই তার ভাল। চাঁদের লোভে হাত বাড়িয়ে ঘরের মাটির দীপটি সে হারাবে না।

রমেশদা তাকে দেখছে। দেখুক। কমলা রমেশের চোখ থেকে তার মুখ ঈষৎ ফিরিয়ে রাখল। আড় চোখে দেখতে থাকল রমেশকে। কিন্তু অনেকক্ষণেও যখন রমেশ তার ওপর থেকে চোখ ফেরায় না তখন অধৈর্য কমলা বলল, 'আমাকে এমন খুঁটে খুঁটে কী দেখছ রমেশদা?'

চোখের কোণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে হাসল কমলা।

রমেশ হাসল না। কমলার ওই লোভ জাগান ভঙ্গীতে ভুলবে না রমেশ। সে রসিকতা করছে। এই তার স্বভাব। কারও অপেক্ষায় বসে বসে মজা করে সময় কাটান।

রমেশ বিবর্ণ গলায় বলল, 'তোমাকে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম আমার থেকে তোমার চাকরেরও পয়সা বেশি। বেচি ত চা, কী আর পয়সা পাব বল? একা আছি তাই কোন মতে চলে যাচ্ছে।'

কথাটা বলতে পেরে, বলে ফেলে রমেশ স্বস্তি পেল। হাল্‌কা হল। উষার প্রসঙ্গটা ওঠার আগেই কথাটা বলতে পেরেছে রমেশ। এর পরে কমলা উষার কথা তুললে অনায়াসে সে এড়িয়ে যেতে পারবে।

'আচ্ছা রমেশদা, তুমি চাকরি করবে?' রমেশের খুব কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল কমলা।

কমলার গলার স্বরে বলার ভঙ্গীতে রমেশ আন্তরিকতার স্বাদ পেল। এদের ভালবাসার থেকে এদের দেওয়া চাকরি অনেক ভাল। অনেক নিশ্চিত। এদের ভালবাসা আজ আছে কাল নেই। চাকরি আজ পেলে কালও থাকবে। রাখতে পারলে চিরদিন থাকবে। রমেশ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল।

'কেন করব না। এই অভাব নিয়ে থাকব নাকি চিরদিন? চিরদিন পচব নাকি? দেবে চাকরি? নাকি গরীব বলে ঠাট্টা করছ?' উৎসাহে ব্যস্ত হয়ে উঠল রমেশ।

'না ঠাট্টা নয়। চাকরি তোমাকে দিতে পারি।' গম্ভীর গলায় বলল কমলা।

'কি চাকরি?'

'এই ধর, সব সময় আমার কাছে কাছে থাকবে। আমাকে ভালবাসবে। আমি তোমাকে ভালবাসব। দুজনে দুজনের চোখের মণি হয়ে থাকব।'

যেন সত্যি সত্যি বলছে কমলা।

'যাও তোমার কেবল ঠাট্টা।'

রমেশ হাসল। হেসে বিরক্ত হল। বিরক্ত হয়েও যেন কোথায় একটা গভীর সুখের স্বাদ পেল।

'ঠাট্টা!' রমেশের দিকে ঘন চোখে দু' মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কমলা বলে উঠল, 'আচ্ছা রমেশদা, আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়। আমার খুব পয়সা হয়েছে?'

'তুমি রানী হয়েছ!' গাঢ় গলায় উচ্চারণ করল রমেশ।

'তাহলে তুমি ঠাট্টা ভাবছ কেন, রমেশদা? মগ্নকণ্ঠে বলল সে, 'আমার সেই রানীর মত পয়সায় আমরা দুজনে ঘর বাঁধব কোন সমুদ্রের ধারে, অথবা কোন পাহাড়ের গায়ে। দুজনে মুখোমুখি বসে জীবন কাটিয়ে দেব চখা-চখি বন-পায়রার মতন। পারব না?'

অবাস্তব একটা কথা। তবু রমেশ চমকে উঠল। রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। তবু ক্ষণকাল মুগ্ধ হয়ে রইল। অন্যমনস্ক হল। অন্যমনস্ক চোখে কমলাকে দেখল। নাগালের অনেক উঁচুতে গাছের মগডালে একটি পাকা মিষ্টি ফল যেন দেখল। ঊষার মতন কাছে করে কমলাকে কোনদিন পাওয়া যাবে না, ভাবল রমেশ। ঊষা

খাঁচার পাখি। কমলা বনের হরিণ। একটা নিঃশ্বাস ফেলল রমেশ। নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'আমার মা বলত…'

আরম্ভ করে আবার থামল রমেশ।

'কি বলত তোমার মা?' রমেশের মুখের ওপরে কিছুক্ষণ চোখ পেতে রেখে অধৈর্য গলায় শুধোল কমলা।

দূরের এক গাছের পাতার কুঞ্জে উদাসীন চোখ রেখে রমেশ বলল, 'রূপকথা।'

'এক রানী এক রাখালকে ভালবাসত।'

'বেশ ত আমিও না হয় তোমাকে ভালবেসেছি।' চুপ গলায় স্বর গাঢ় করে বলল কমলা।

'তারপর শোনই না।'

কমলার চোখের ওপরে চোখ নামিয়ে এনে ছোট একটা ধমক দিল রমেশ।

'রাজা কেমন করে যেন জেনে ফেলেছে রানীর সেই গোপন প্রেমের কথা। একদিন রাখাল মাঠের কোণে আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছিল। রাজা কোত্থেকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এসে তলোয়ারের এক কোপে রাখালের মুণ্ডুটা কেটে ফেলল।'

কমলা রমেশের গল্প বলার ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল; কিন্তু হাসিটা মাঝে কেমন বিশ্রী হয়ে ভেঙে ভেঙে গেল।

জুহুর সমুদ্র পারের সন্ধ্যা। একটা মানুষ বালির ওপরে মুখ থুবড়ে আছে। নিস্পন্দ। মুখের কাছে বালিতে একচাপ রক্ত শুকিয়ে আছে। ছবিটা ঠিক তখনই মনের মধ্যে ভেসে ওঠার জন্যই বুঝি হাসিটা ছিঁড়ে ভেঙে এমন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে! কিন্তু পাছে রমেশ কিছু অনুমান করে। আবার ছেঁড়া ভাঙা হাসিটাকে জোড়া দিল কমলা। হাসি জড়ান তরল গলায় বলল, 'কিন্তু আমার ত কোন রাজা নেই, তোমার মুণ্ডু কাটবে কে?'

'বারে, যে বাবু তোমাকে রানী বানিয়েছে সে জানলে আমাকে আস্ত রাখবে!'

'বেশ তাহলে আমাকে ভালবাসার চাকরিতে কাজ নেই।'

করুণ করুণ মুখ করল কমলা। স্বর বিষণ্ণ করে বলল, 'কাজ নেই আমাকে নিয়ে তোমার সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ের চূড়োয় ঘর বেঁধে। তুমি অন্য চাকরি করবে ত?' এবার সুর পাল্‌টাল কমলা, উত্তাপ আনল স্বরে, 'খুব ভয়ের চাকরি কিন্তু।' ভয় দেখান গলায় বলল, 'বিপদের ঝুঁকি আছে। তবে হাঁ', আশ্বাস দিল আবার, 'যেমন ভয় বিপদ আছে, তেমনি টাকাও আছে। এক বছরে। এক বছরে বলছি কেন, ছ' মাসে বাড়ি গাড়ি করে ফেলতে পারবে। যদি চাও আমার মতন একটা রানীকেও বাঁদী করতে পারবে।'

পিচ্ছিল রেখায় হাসল কমলা। চোখে কামনার দীপ জ্বেলে তাকাল।

কমলা ওর অভাবকে বিদ্রূপ করে নাকি? কমলার জন্যে ওর লোভকে? কমলা ভাবে বুঝি ওর জন্যে রমেশের বড় লোভ। কমলা রমেশের মনে বুঝি লোভের আগুন উসকে দিতে চায়। সেই চোখেই চায় কমলা। মজা দেখতে চায়। রমেশ মনে মনে হাসল। কমলার ফাঁদে সে পা দেবে না কখনও। সাদা গলায় বলল, 'অতভে দরকার নেই, ভদ্রভাবে খেয়ে পরে যদি থাকতে পারি তাতেই সুখী হব। তুমি পার ত তেমন একটা ছোট চাকরি করে দাও।'

চাকরি দেবার জন্যেই রমেশকে খুঁজছিল কমলা। রামবিলাসের একটি বিশ্বস্ত লোক দরকার আর কমলার দরকার একটি মনের-মানুষ। বলিষ্ঠ এক যুবক। ব্যভিচার করে করে যে তার শরীর খুয়োয়নি। লোভ সামলে সামলে যে তার সমস্ত শক্তি অটুট

রেখেছে। যে তাকে চরম তৃপ্তি দেবে। কমলার সর্বাঙ্গ-অর্পণ-দক্ষ দেহ পেয়ে যে তার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। একজন তেমন পুরুষ না থাকলে যেন বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। বেঁচে থেকে সুখ থাকে না। এ লাইনের তাই এও একটা রীতি। একজন মনের মানুষ থাকে প্রত্যেকের। সে তার স্বামী নয় অর্থাৎ প্রভু না। স্বামীর থেকে বড় অর্থাৎ মনের মানুষ। রমেশদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে রমেশদাকে বড় ভাল লেগেছিল কমলার। কিন্তু তখন কমলা এত গরীব যে একজন বাঁধা-পুরুষকে পোষা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রমেশদা যদি তার মত গরীব না হত তবে তখন চেষ্টা করত। রমেশদ[illegible] পাওয়া কঠিন ছিল না। কমলা তার মনে বরাবরই জ্বালা আসছে। রসালো গল্প বলে, গায়ে গা ঠেকিয়ে, গালে গ[illegible] কমলা ওকে অনেক দিন পরখ করেছে, দেখেছে, [illegible] চোখের তারা শিখা হয়। গা কাঁপে। একটা তীব্র বা[illegible] সর্বাঙ্গ মনে ছমছম্ করে। সে-সব সময় কত দিন [illegible] কমলার—ওই বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে পিষ্ট হোক সে। রমেশদা [illegible] সর্বাঙ্গ নিংড়ে নিংড়ে তাকে সুখী করুক। রমেশদা সাহস করেনি। করলে সে-সব দিনে কমলার সে-বাসনা পূর্ণ হত। নিজেকে স্বেচ্ছায় একেবারে বুকের মধ্যে ঠেলে না দিলে সে-সাহস বুঝি একটা ফেরিঅলার হবার কথা নয়। নিজে সে সাহস করে হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে পারে না। আজও পারবে না। পারবে না যে তা সে তার রানী আর রাখালের গল্প শুনেই বুঝেছে। রমেশদার সে গল্প শোনার আগেই বুঝেছিল কমলা। রমেশদার চোখের ভেতর তাকিয়ে সে দেখেছে, সেদিনের সে আগুনও যেন আজ আর ওর চোখে নেই। চোখে জ্বলছে না। এত যে সাজগোজ কমলার। এত যে ইশারা চোখে তবু তাতছে

না রমেশদা। রমেশদা নিজেকে বড্ড ছোট মনে করে। আজ কমলা অনেক পয়সার মানুষ ভেবে তাকে আরো দুর্লভ মনে করছে বুঝি রমেশদা। নিজেকে তার অযোগ্য মনে করছে। ওকে যোগ্য করে তুলতে বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা কমলার। রমেশদাকে তার চাই। ওই সবল সুন্দর নীরোগ শরীরের মধ্যে কমলার জন্যে অথৈ সুখ আছে। সুখের খনি যেন রমেশদার শরীরে। সেই বিপুল সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না কমলা। সে ওর মালিক হবে। যদি নিজের সব বাসনা, এই ‍মান্য বাসনার তৃপ্তি না হল, এ লাইনের জীবনে তাহলে সুখ ‍পেল সে। যাকে চায় সে, সবাইকে তার পাওয়া চাই। কর্ম-কঠিন সংযম-পুষ্ট সুঠাম শরীর দেখতে দেখতে মশগুল কমলা। কতদিন এমন পুরুষ ভোগ করেনি কমলা। ‍কাল একজন ভাল ময়রার তৈরি খাঁটি ছানার সন্দেশ ‍মনি এ‍টা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অশান্তি তাকে অসহিষ্ণু ।

'তুমি একটা বোকা রমেশদা, চাওয়ার কী কখনো সীমা রাখতে আছে?' অনেকক্ষণ পরে বলল কমলা।

রমেশের ইচ্ছে হল পরখ করে কমলাকে। তখনই আবার মনে হল, সেইটে মস্ত আহাম্মুকী হবে। যার ধনের দৌলতে কমলা আজ রানী তাকে ফেলে কোন্ লোভে রমেশকে নিয়ে ঘর বাঁধতে যাবে সে। এ সব তার মশকরা। বিশ্বাস করে হাত বাড়ালে কমলা বিদ্রূপ করে হেসে উঠবে! কমলার একটা পুরনো কথা মনে পড়ল রমেশের। আমরা হচ্ছি ময়রার মিঠাই। দাম না দিলে গালে ফেলা যায় না।

রমেশ বলল, 'বারে, চাইলেই শুধু হয় নাকি? যোগ্যতা চাই ত।'

'যোগ্যতা তোমার আছে।' নিবিড় গলায় বলল কমলা।

'বিদ্যা-বুদ্ধির যোগ্যতা কই আমার?'

'দরকার নেই', কমলা সজাগ গলায় বলল এবার। 'বুদ্ধি তোমার যা আছে তাতেই চলবে। সাহস চাই। সেও তোমার আছে জানি, নইলে আমাদের জন্যে মানুষ জোটাতে কি করে।'

'বেশ তবে দাও চাকরি। এক্ষুনি নিই। ছুঁড়ে ফেলে দিই কলসি ঝোলা।'

'না না ওটা এখন থাক। চাকরি তোমার পছন্দ হবে কি হবে না তার ঠিক নেই এক্ষুনি ফেলে দেবে কি গো।' 'চাকরির প্রয়োজনেও যে চা ফেরিঅলার ভেক চাই কমলা এখন তাকে সে কথা বলল না। 'কিন্তু রমেশদা তোমার কি আক্কেল বল ত। আমাকে এতক্ষণের মধ্যে এক ভাঁড় চা খাওয়ালে না অথচ তোমাকে কেমন একটা চাকরি করে দিচ্ছি।' রমেশকে লজ্জা দিয়ে হেসে উঠল কমলা।

রমেশ জিভ কেটে বলল, 'দিচ্ছি, এক্ষুনি খাওয়াচ্ছি চা।' নতুন চায়ের গুঁড়ো দিয়ে চা তৈরি করতে করতে বলল, 'অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে এক ভাঁড় চা খাওয়াবার ইচ্ছে হচ্ছিল আমার, কিন্তু আজ তোমার মুখে এ চা রুচবে কিনা ভেবে আর বলতে সাহস পাইনি।'

কমলার হাতে চায়ের ভাঁড় তুলে দিল রমেশ।

চায়ে চুমুক দিয়ে কমলা ভাবল—তার অনুমান মিথ্যে নয় তবে। এই ব্যবধানের জন্যেই কমলার এমন স্পষ্ট ইশারাও রমেশের চোখে রঙ ধরাতে পারেনি।

'এই দশ মাসেই তুমি যে আমাকে কতখানি পর করে ফেলেছ এখন বুঝলাম।' গলায় এক ঢেলা বেদনার বাষ্প সঞ্চার করে বলল কমলা। চায়ে আর এক চুমুক দিয়ে বলল, 'অথচ আমি

তোমায় এতটুকু ভুলিনি। এগার মাস পর আজ কলকাতায় পা দিয়ে সব আগে ছুটে এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।' চোখ দুটোকেও বুঝি কমলা বিষণ্ণ করে তুলল।

রমেশ অবাক। এ যে রমেশের অতি বড় দুরাশার স্বপ্নেরও অতীত। কমলা তাহলে তাকে সত্যি ভালবাসে। সে যে এত কথা বলত, এখনও বলছে তা তামাসা নয়। রমেশ ভীষণ বিচলিত হল। আজ যে কমলা এত বড় লোক হয়েছে তবু তাকে ভালবাসে। সে যে আজও সেই নোংরা ফেরিঅলা আছে তবু ভালবাসে!

মনের মধ্যে ভীষণ লোভ নিয়ে মানুষ নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে যেমন করে তাকায় সে চোখে কমলাকে দেখতে দেখতে রমেশ বলল, 'তোমার বাইরেটা এত বেশি পাল্‌টেছে যে, মনের মধ্যে তুমি সেই সেদিনের মত তেমনই আছ, সে কথা ভাবতে আমি এক বিন্দুও সাহস পাইনি।'

শূন্য চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কমলা বলল, 'যেদিন বাইরে আর ভেতরে এক ছিলাম সেদিনই কি সাহস পেয়েছিলে নাকি! আসলে তুমি ভীরু। অতিশয় ভীরু।' একটা কটাক্ষ হেনে তার হাত ধরল সে।

'এস।'

'কোথায় যাব?'

'তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করিয়ে এখনই তোমাকে চাকরিতে বহাল করে দিই।'

'এই ঝোলা কলসি নিয়ে যাব নাকি?'

'কিছু দোষ হবে না, এস।'

খ

ট্রাম ডালহৌসী যেতে যে পথে গুমটি থেকে বেরোয় তারই ডানধারে ফাঁকা ফুটপাথের গায় সুন্দর একখানা গাড়ি। আনকোরা নতুন। সদ্য বুঝি দোকান থেকে পথে নামান হয়েছে। কাক-কালো টায়ার। এক ফোঁটা ধুলোমাটি নেই, টাটকা গোলাপ রঙের ভেলভেট সিট তক্‌তক্‌ করছে। দুধের সরের মত রঙ গাড়ির ছাদে, সারা গায়ে আলো পড়েছে। আলো পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আলোর আঙুলগুলি গাড়ির মসৃণ গায়ে নরম করে হাত বুলোচ্ছে।

রমেশ অন্যমনস্ক চোখে গাড়িটা দেখছিল। কমলা রমেশের পাশে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফিস্‌ফিস গলায় বলল, 'এমন একখানা গাড়িতে করে তোমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা যদি বেড়াতে বেরোই। অনেক দূরে। কোনদিন বজবজ ডায়মণ্ডহারবার। কোনদিন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যতদূর যেতে মন চায়, কেমন হয় !'

রমেশ কমলার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকোল।

'ঠাট্টা নয়', কমলা হাসল। 'সত্যি যাব রমেশদা, তুমি আর আমি। এ গাড়ি আমার। ওই যে আমার বাবু আসছে। কাছে এলে হাতজোড় করে নমস্কার করো।' কানে কানে বলল কমলা।

কমলার গাড়ি। কমলার বাবু। এক বিস্ময় থেকে আর এক বিস্ময়ে রমেশকে ঠেলে দিল কমলা। রমেশ চমকে উঠল। তাকাল।

কমলার বলতে হত না। ওই বিপুল ভুঁড়িতে যে অগুণতি টাকা এ কথা ভেবেই শ্রদ্ধায় দুহাত আপনা থেকে যুক্ত হয়ে কপালে এসে ঠেকত। ঠেকল।

কমলার বাবু কাছে এলে কমলা যখন বলল, 'এই আমার রমেশদা।'

তখন, তার আগেই রমেশ হাতজোড় করে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে এমন ভাব করে নমস্কার জানাল যেন পায়ে উবুড় হয়ে প্রণাম করতে পারলেই সে খুশি হত ; কিন্তু কমলার নির্দেশ হাতজোড় করে নমস্কার করতে হবে।

খুব খুশি হয়েছে রমেশকে দেখে এমন করে হেসে কাঁধ চাপড়ে দিল লোকটি। বলল, 'রমেশদা ? কমলির রমেশদা ! বেশ বেশ।'

দরাজ গলা সরল হাসি মাইডিয়ার ব্যবহার। রমেশের আশ্চর্য ভাল লাগল। সে ভুলেই গেল লোকটির বিপুল ভুঁড়ি দেখে দূর থেকে বিচ্ছিরি লেগেছিল তার। এখন ভিন্ন চোখে দেখল। বিচ্ছিরি লাগল না আর। ভুঁড়ি আছে, তবে অসহ্য কিছু নয়। অমন লম্বা-চওড়া লোকের এমন একটু ভুঁড়ি না থাকলে বুঝি মানায় না।

'তা রমেশদা', সেই দরাজ আমার-প্রিয় গলায় বলল আবার লোকটি, 'কমলির কাছে শুনেছ ত সব, করবে চাকরি ?'

রমেশ জবাব দেবার আগেই কমলা বলল, 'আমি বিশেষ কিছু বলিনি। সামান্য আভাস দিয়েছি। রমেশদা আমার ভীষণ বিশ্বাসী মানুষ। ওকে দিয়ে তুমি যে-কোন কাজ করাতে পারবে।'

'কি বল রমেশদা ?'

'নিশ্চয়। আপনি আমার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।' ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল রমেশ, 'আমার কাজে আপনি খুব সন্তুষ্ট হবেন। আর বিশ্বাসের কথা যদি বলেন, আমি নিজে মরব তবু কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করব না, দেখবেন।'

'বেশ, বেশ, এই ত চাই। কাজ যদি ঠিকমত করতে পার রমেশদা, তোমাকে আমি বড়লোক বানিয়ে দেব। এস।'

'ওকি তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?'

'আমরা একটা ট্যাক্সি নেব। তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও।'

'না। তোমরাও এস। আমাকে কমলালয়ে নামিয়ে দিয়ে

তোমরা গাড়ি নিয়ে চলে যেও। তোমরা পৌঁছে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিও আমাকে। ততক্ষণ আমি কমলালয়ে অপেক্ষা করব।'

'আজ আবার কমলালয়ে কি!'

'বারে, কী বলেছিলে? সেই ভেলভেটের ব্লাউজ আর সাড়িটা আজ কিনব।'

বাবু হেসে বলল, 'একেবারে নগদ আদায় করে নেবে? বেশ ওঠ। ওঠ রমেশদা। তোমার কলসি ঝোলা ড্রাইভারের পাশে রাখ।'

গাড়ি কমলালয়ের সামনে থামল। কমলা গাড়ি থেকে নেমে ডাকল, 'এস রমেশদা।'

'আবার রমেশদাকে কেন?' বিরক্ত গলায় বলল বাবু।

'বেশ ত তুমি!' কমলাও ঘাড় কাত করল। 'বেচারার জামা-কাপড়ের দশা দেখেছ? ওর কিছু আছে নাকি? সব কিনে দিতে হবে। আর শোন', বাবুকে উদ্দেশ করে যেন আদেশ করল কমলা, 'রমেশদাকে আজ কিছু টাকা দিয়ে দিও।'

'দেব। যাও রমেশদা। ওকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিও।' বাবু সিটে কাৎ হয়ে সিগারেট ধরালেন।

জামা জুতো কেনা হলে রমেশকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে নিজের জন্যে ভেলভেটের একটা ব্লাউজ আর একখানা শিফন সাড়ি কিনল কমলা. তারপর ছেড়ে দিল রমেশকে। বলল, 'মাল সব প্যাক হতে যাচ্ছে। গাড়ি এলে সব নিয়ে আমি বাড়ি চলে যাব। আজ আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। কালই অথবা পরশু দুপুরের পরে চলে যেও আমার বাড়ি। অবশ্যি যাবে কিন্তু।' একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিতে দিতে বলল, 'না। দুপুরেই যেও। আমার ওখানেই খাবে। পরে তোমার থাকা খাওয়ার একটা ভাল জায়গার ব্যবস্থা করে দেব আমি। আর শিয়ালদা স্টেশনে নয়। তুমি কোন হোটেলে থাকবে রমেশদা।'

গ

রাতের ফেরি শেষ করে যতক্ষণ না ফেরে রমেশ উষা জেগে বসে থাকে। যতক্ষণ অন্য ঘরের লোক জেগে থাকে দাওয়ায় বসে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। তারপর সবাই যখন একে একে গিয়ে শোয় উষা ঘরে এসে লণ্ঠন জ্বেলে কোন একটা কাজ নিয়ে বসে। আজ উষা তার একটা ছেঁড়া সাড়ি সেলাই করছিল। রমেশ ঘরে ঢুকে তার ঝোলা কলসি রাখল। উষা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তক্তপোষ থেকে পা নামিয়ে দিল। নামবে। রমেশ এসে তার কাছে দাঁড়াল।

'কি করছিলে?'

'ছেঁড়া সাড়িটা সেলাই করছিলাম।' সূচটা অসম্পূর্ণ সেলাইয়ের মধ্যে ফুঁড়ে রাখতে রাখতে জবাব দিল উষা।

রমেশ তার হাত থেকে কাপড়টা কেড়ে নিল। এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'সেলাই করা সাড়ি আর তোমাকে পরতে হবে না। রেখে দাও।'

'বারে কাল সকালে উঠে বাসি কাপড় ছাড়ব যে।'

উষা কাপড়টা কুড়িয়ে আনবার জন্যে হাত বাড়াল।

রমেশ উষার হাতটা সরিয়ে দিল।

'না। ও কাপড় পরতে হবে না। নতুন কাপড় কিনে দেব।'

'নতুন কাপড়?' উষা অবাক চোখে তাকাল। টাকা কোথায় পাবে?'

'এই যে টাকা।'

দশ টাকার বিশখানা নোট পকেট থেকে বের করে উষার কোলে ছুঁড়ে দিল রমেশ। এমন্নি করে বউয়ের সামনে টাকা ছুঁড়ে দিতে পারার অহংকারে নিজেকে উষার ঈশ্বর বলে মনে হল রমেশের।

'এত টাকা কোথায়-পেলে?'

বিস্ময়ে আশংকায় চোখ বড় হয়ে উঠল উষার।

'চাকরি পেয়েছি।'

আত্মশ্লাঘার একটা খুশি ঝিকিয়ে উঠল রমেশের চোখে।

'কবে চাকরি পেলে? কই বলনি ত কিছু!' উষা যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে এমন স্বরে বলল।

'আজই পেয়েছি।' যেন সান্ত্বনা দিল রমেশ।

'আজ চাকরি পেলে আর আজই তোমাকে এতগুলি টাকা দিল। এ কেমন চাকরি!'

গোড়ায় যে আশংকা উষার মনের কোণে উঁকি মেরেছিল, এবার ভয় হয়ে তা সারা মনে ছেয়ে গেল।

দেয় না। সে যেমন চাকরি হোক। কাজে বহাল হলে, দু'চারদিন কাজ করলে তারপর হাত পাতলে ক্ষমা ঘেন্না করে দু'চার টাকা হয়ত মেলে। কিন্তু এত টাকা! রামবিলাসবাবুর ওপর কমলার কর্তৃত্ব দেখে রমেশ অবাক হয়ে গেছে। অত বড় এক ধনী যার মুঠোয় সে কি না রমেশের মত একটা ফেরিঅলাকে ভালবাসে। গর্বে রমেশের বুক ভরে ওঠে কিন্তু সে গর্ব ত প্রকাশ করা যায় না উষার কাছে। কমলার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এ কথাই সে তাকে বলতে পারবে না কোনদিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমেশ বলল 'না, তেমন চাকরি নয়। ফ্যানের তলায় চেয়ারে বসে করবার চাকরি কে দেবে আমাকে?'

'সে জানি। কিন্তু এই-বা কেমন চাকরি! কী কাজ তুমি করবে যার জন্যে আগাম তোমাকে এতগুলি টাকা দিল?'

উষার স্বরে তার মনের ভয় থক্‌থক্‌ করতে লাগল।

রমেশ হাসল। উষার চোখে তাকিয়ে বলল, 'তা, অনুমান করেছ ঠিক, কাজটা শক্তই একটু। ভয় বিপদের ঝুঁকি একটু নিতে হবে বই কি।'

শুনতে শুনতে উষা রুদ্ধশ্বাস নীরক্ত হয়ে উঠল। একটা দুঃস্বপ্ন-দেখা আতঙ্কে চমকে উঠে টাকাগুলি কোল থেকে ফেলে দিল সে। তড়িতাহতের মত ছিটকে নিচে নেমে এল। আর এমন তরাসে দৃষ্টিতে টাকাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকল যেন সাপ দেখছে, ফণা তোলা সাপ—গোখরো সাপ। কিছুক্ষণ মুখের মধ্যে জিভটাকে যেন খুঁজে পেল না উষা। তারপর জলের অনেক নিচে থেকে উঠে-আসা মানুষের মত হাঁফধরা গলায় বলল, 'না না, এ টাকা আমি ছোঁব না। এ টাকা আমাদের চাইনে। এ টাকা তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এস।'

পিছু হটে হটে রমেশের কাছে সরে এল উষা। তখনও বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল নোটগুলির দিকে। যেন তাকিয়ে না থাকলে, কি চোখ ফিরিয়ে নিলে, ওগুলি সাপ হয়ে তেড়ে এসে এক্ষুনি ছোবল মারবে।

রমেশ তার চিবুক ধরে সান্ত্বনা দিল।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন? বিপদ ভয়ের ঝুঁকি না নিলে কেউ বড়লোক হতে পারে নাকি!'

'না না, আমাদের বড়লোক হয়ে কাজ নেই। তুমি যা রোজগার করছ তাতেই আমাদের দিব্যি চলে যাচ্ছে। না, এ কাজ তুমি কিছুতে করতে পারবে না।'

উষা রমেশের গলা জড়িয়ে ধরল।

'আমরা এই বেশ আছি। সুখে আছি। আমরা বড়লোক হতে চাইনে। সুখী হতে চাই।'

না। উষা দুঃখ চায়। দুঃখের শান্তি। দুঃখ পুইয়ে সুখ। কিন্তু রমেশ তা চায় না। সে টাকা চায়। ভয় বিপদ মাথায় করেও সে টাকা চায়। টাকার আরাম। টাকার সুখ। সচ্ছলতার আনন্দ। উষা সে সুখ আরাম চায় না বলে সে কমলার মত বড়লোক হতে

পারল না। জীবনটাকে ভোগ করতে পারল না কমলার মত। ধনী হতে পারল না।

'ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরে কী সুখ উষা! কী সুখ শুধু কুমড়োর ঘঁ্যাট আর ডাল ভাত খেয়ে! এ ছেঁড়া কাঁথায় ঘুমিয়ে কী শান্তি! তোমার কি বড়লোক হতে ইচ্ছে করে না উষা?'

'না না।'

উষা রমেশের বুকে মাথা রেখে শিশুর মত আপত্তি জানাল।

রমেশ এবার বিরক্ত হল।

'না, না, কী! ফ্যানের তলায় বসে নিরাপদে টাকা রোজগার করবার সুযোগ কে দেবে আমায়? সে বিদ্যেই কী আমার আছে নাকি! আমার মত মানুষের টাকা রোজগার করতে হলে ভয় বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে। আর সামান্য ঝুঁকি নিয়ে যদি এতগুলি করে টাকা রোজগার করা যায়, কেন করব না?' তারপর লোভ জাগানর মতন গলার স্বর করে বলল, 'তুমি ভাবছ খুন ডাকাতি পকেট মারের চাকরি নিয়েছি, না?' উষাকে বুক থেকে ছাড়িয়ে তার দু কাঁধ ধরল রমেশ। 'শোন, সে সব কিচ্ছু নয়। কিচ্ছু ভয়ের কাজ না। এই ত বাড়ি ফেরার পথেই সেরে এলাম একটা। ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারটা জান ত? ওখানে একটা বিড়ির দোকানে গেলাম। আমাদের কোম্পানির কতকগুলি সাঁটের কথা আছে। দোকানীকে তারই একটা বললাম। সেও সাঁটে জবাব দিল। তখন বললাম ভাই আমার ঝোলা আর কলসিটা রাখ একটু, আমি ওই পার্কের পাইখানা থেকে এক্ষুনি ফিরে আসছি। পাইখানা-টানা কিছু না আমি তবু সেখান থেকে ঘুরে এলাম। ততক্ষণে ঝোলার থেকে দোকানদার মাল সরিয়ে রেখেছে। আমি ঝোলা কলসি চেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

এই ত সামান্য কাজ। এর জন্যে কেউ যদি মোটা টাকা দেয়, কেন নেব না?'

'এটা খুব সামান্য কাজ হলে কেউ এত টাকা দিয়ে লোক রাখে? কী ছিল তোমার ঝোলায়?' শুকনো গলায় শুধোল উষা।

এবার রমেশ মুখ টিপে হাসল। সে হাসি উষার কলজের কুশনে যেন পিনের মত এসে বিঁধল।

'কই বল?'

ব্যস্ত ভীত অস্থির হয়ে উঠল উষা।

রমেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'কোকেন।'

'কোকেন!' যেন কঁকিয়ে কেঁদে উঠল উষা। বলল, 'কোকেন, গাঁজা, আফিম, মদ এ-সব বে-আইনী মাল পাচারের কাজ নিয়েছ! আর বলছ সামান্য কাজ!' উষা ভীষণ কাঁপতে থাকল। ভয়-কান্না-ত্রাস-কাঁপা গলায় বলল, 'ওগো, তুমি আমার সর্বনাশ করো না। আমি তোমাকে চাই। আমি টাকা চাইনে। টাকার জন্যে তোমাকে আমি হারাতে চাইনে। তোমার বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারলে এই ছেঁড়া কাপড়, খোলার ঘর, এ-ই আমার সাত রাজার ধন। এ কাজ তুমি কিছুতে করতে পারবে না। না, না, এ কাজ আমি তোমাকে করতে দেব না। কিছুতে না।'

উষা রমেশকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল। যেন এক্ষুনি রমেশ কোথাও চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না আতঙ্কে সে তাকে ছাড়তে চাইছে না।

আচ্ছা আপদ হয়েছে ত এই ভয়কাতুরে ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটাকে নিয়ে। উষার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবছিল রমেশ। একটু পরে বিরক্ত হয়ে উঠল। অধৈর্য হল। ক্রমশ একটা জেদ পেয়ে বসল তাকে।

সে উষাকে বুক থেকে ছিঁড়ে এনে তার কাঁধের নিচে শক্ত করে

ধরে বলল, 'কান্না থামাও। কাঁদতে পারবে না। তুমি চেয়েছিলে —তুমি পান বেচবে, লজেন্স ফেরি করে আমাকে সাহায্য করবে। আমি তোমাকে তা করতে দেইনি বলে সেদিনও তুমি কেঁদেছ। আমি সকালে আনাজ-তরকারি বেচি বিকেলে চা বেচি। খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে যাচ্ছে এই বলেও কতদিন তুমি কেঁদেছ। আজ আবার একটা মোটা রোজগারের সুযোগ যদি পেলাম, তোমার সর্বনাশ করছি বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ। না। না। এ সব ফ্যাচফ্যাচে কান্নার নেকামো চলবে না। চলবে না। আমি কিছুতে এ সব বরদাস্ত করব না।' রমেশ উষাকে দুহাতে দুরন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, 'আমি তোমার স্বামী', স্বামিত্বের অহংকারে শুষ্ক কঠিন হয়ে উঠল রমেশের গলা, 'আমি যা করব তাই তোমাকে মেনে নিতে হবে, তাতেই তোমাকে সায় দিতে হবে।'

রমেশের নির্মম কথায় আর নিষ্ঠুর ঝাঁকুনিতে ভয়ানক চমকে উঠল উষা। ভীরু বিহ্বল চোখ করে অপলক তাকিয়ে রইল সে রমেশের দিকে। তার বেত-ফল-নীল দীঘি-দীঘি চোখ দুটো ছলছলে জলের তলায় ক্রমশ নিরালোক অন্ধকার হয়ে উঠতে থাকল। তার চেতনা বুঝি ঝিমিয়ে পড়তে থাকল ধীরে ধীরে।

রমেশের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলতে থাকল 'আমি টাকা চাই। যেমন করে হোক আমার টাকা চাই। লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো যেখানেই আমার হাতে ঠেকবে আমি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাব। আমি বড়লোক হব। ভাল বাড়িতে থাকব। লাইট থাকবে। ফ্যান থাকবে। রেডিয়ো থাকবে। তোমাকে অনেক সাড়ি দেব। অনেক গহনা। ঝি রাখব। চাকর রাখব। তুমি রানীর মত থাকবে।'

বলতে বলতে কমলার গাড়ি সাড়ি সাজগোজ ভেসে উঠল রমেশের চোখে। সেগুলি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠে ঝলসে দিয়ে গেল

রমেশের চোখ। কমলার পাউডার-ঘষা রুজ-লেপা মুখ এসে লেপ্‌টে গেল উষার মুখে। কমলাকে চুমু্‌ খেতেই যেন সহসা উষাকে বুকের মধ্যে সাপটে ধরল রমেশ। প্রবল উত্তেজনায় তার গালে ঠোঁট চেপে ধরল। এমনি করেই যেন কমলাকে পাওয়ার দুর্লভ সুখকে ভোগ করতে চাইল রমেশ।

দুই

শিকল-পরা একপাল বন্দীর পথ-চলার মত ইস্পাতে ইস্পাতে সহস্র চাকার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে মধ্য রাতের মালগাড়িটা অতিভার-রুষ্ট মহিষের মত ভোঁস্‌ভোঁস্‌ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

রমেশের দুরন্ত আদরের মধ্যে এক সময়ে সব ভয় ভুলে ক্লান্ত ক্লিষ্ট উষা নির্জীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাতের শান্ত বাতাস-মথিত ট্রেনের আর্ত নিঃশ্বাস বুঝি হৃদ্‌পিণ্ডে এসে আছড়ে পড়ল উষার। ঘুমের মধ্যে বিষম চমকে উঠল উষা। সেই যে ঘুম ভাঙল সারা রাতে আর এক ফোঁটা ঘুম এল না তার। এক গা-ছম্‌ছম্‌ ভয় নিয়ে রমেশের বুকের মধ্যে শুয়ে অবশিষ্ট রাত শুধু অন্ধকার দেখল উষা।

হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে ইঁদুর আরশোলা কুট্‌কুট্‌ করে কী কাটে। ছুঁচোগুলি কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করে ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে চলে যায়। কোথায় একটা কুকুর ডেকে ওঠে। কার ঘরে একটা বাচ্চা কাঁদে কিছুক্ষণ। দুর্গাপুর পুলে এসে মেশা পাহাড়-মতন উঁচু রাস্তাটার দুপাশের বড় বড় গাছগুলির ঝোপ-ঝোপ পাতার নিভৃতে স্বপ্নে-জাগা পাখি ডানা ঝাপটায়। আদি গঙ্গায় মরা কোটাল এসেছে। বেহালার ঢিলে তারে এক ঘেয়ে ছড়ি বুলানর মত জলের স্রোতে একটা উদাসীন সুর বাজে। অনাহত সুর ভাঁজে ঝিঁঝি পোকা, ঘুগরো, উচ্চিংড়ে। এই আবহসঙ্গীতের বাতাবরণের আড়ালে আড়ালে কাদের চুপ-চুপ পায়ের নিঃশব্দ

সঞ্চরণ শোনে ঊষা। কারা যেন একে একে, দলে দলে, পা টিপে টিপে আসছে। এসেছে। জড় হয়েছে। তাদের মুখ অন্ধকারের মত কঠিন। কালো এবড়োথেবড়ো আঁকিবুকি রেখায় রেখায় নির্মম। তাদের চোখের তারায় তারায় লাল বাতি। তারা যেন কি খুঁজছে! কাকে খুঁজছে! ঊষা রমেশকে ঘন করে জড়িয়ে থেকে তার বিহ্বল বিস্ফারিত চোখ মেলে থাকে। চোখ ফেরায় না। পলক ফেলে না। পাছে সে ফাঁকে ওরা, ওদের হাত এসে চেপে ধরে রমেশকে। তার কাছ থেকে কেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়।

ভয়ে ভাবনায় ডুবন্ত মানুষের মত অস্থির হয়ে ওঠে ঊষা। আকুল হয়ে ডাকে, 'মা মা মা……'

মা!

ক্ষণকালের জন্যে ঊষার ভয় ডর উবে যায়। অবাক হয় সে। স্তম্ভিত হয়ে ভাবে এ-ও সম্ভব। কী আশ্চর্য!

রোজ গঙ্গাস্নান করলে সোনার অঙ্গ মাটি হয়ে যাবে বলেছিল রমেশ!

'ফুঃ সোনার অঙ্গ না ছাই', সুখে হেসে রমেশের চোখে চেয়ে বলেছিল ঊষা। মনে মনে বলেছিল, অঙ্গ ময়লা হয় হোক কিন্তু পাপ ত ধুয়ে যাবে। তার শরীরে যে অনেক পাপ।

রমেশ বলেছিল, 'পাল পার্বণে গঙ্গাস্নান করো এ ছাড়া বাড়িতে। কলের জলে।'

ঊষা সে কথা গ্রাহ্য করেনি। সে নিত্য গঙ্গাস্নান করে। সময় পেলেই কালীঘাট ছুটে যায়। মাকে ডালা দেয়। মন্দির প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে। গড় করে ঠাকুরভাইয়ের পায়ে। মা তাকে আশীর্বাদ করে কিনা জানতে পারে না; কিন্তু ঠাকুর-ভাইয়ের গলার স্বর শুনে, মুখের দিকে তাকিয়ে সে অনুভব করে,

ঠাকুরভাইয়ের অন্তরের আশীর্বাদ সে পাচ্ছে। কখনো কখনো মনে হয়, মায়ের আশীর্বাদ বুঝি ঠাকুরভাইয়ের মুখ দিয়ে বেরোয়। ভক্তিতে আচ্ছন্ন উষার তখন যেন প্রণাম আর শেষ হতে চায় না। এ সব সময়ে ভ্রূ কুঁচকে যায় পাণ্ডা ঠাকুরের। উষা একটা পাঁচ পয়সা প্রণামী দেয়। পড়ে-পাওয়া-মতন অনাহূত প্রায়ই এই পাঁচটা পয়সা উপরি-উপার্জন চাট্টিখানি কথা না। রাই কুড়িয়েই বেল তাদের। তবু বিরক্ত হয়। ওদিকে রাস্তায় তীর্থযাত্রীদের ঘন ঘন "কালী মাঈকী জয়" ধ্বনি উঠছে। ক'টা দল যে বেহাত হয়ে গেল কে জানে। প্রণামটা এতক্ষণ বসে করবার দরকার কী, ভাবে। কী দুঃখ ওর। ভালবাসার বিয়ের যন্ত্রণা এখনই শুরু হয়েছে, না কি অভাবের তাড়না? যাই হোক, সে তার স্বভাব সিদ্ধ ব্যবসায়ী গলায় যাত্রাগানের পুরোহিতের মত শান্ত সুন্দর স্বরে আবৃত্তি করে, 'তোমার স্বামীর খুব পয়সা হোক দিদি। তুমি সুখী হও।' এ আশীর্বাদ উষার কখনই কিন্তু মনঃপুত হয় না। টাকার সুখ সে চায় না; তার ইচ্ছে ঠাকুরভাই তাকে অন্য আশীর্বাদ করুক। যে আশীর্বাদে সে সত্যিকার সুখী হবে। মুখ ফুটে বলবে ভাবে। আবার ভাবে চেয়ে আশীর্বাদ নিলে তাতে কোন ফল নেই। ফল হবে না। সে মনে মনে কাতর হয়ে বলে, ঠাকুর আমার মনের বাসনা কী তুমি জান না। আমি ত অর্থ চাইনে? আমি চাই······

তুমি কী চাও তাতে পাণ্ডাঠাকুরের কিছু যায় আসে না। তার স্বার্থ তার নিজের অর্থপ্রাপ্তিতে। তোমার মত ভক্তিমতী স্ত্রীর স্বামীর রোজগার যদি বাড়ে তার প্রণামীটাও বাড়বে। পাঁচ থেকে তখন পঁচিশ হয়ে যাবে, অনায়াসে হয়ে যেতে পারে। তাই, সেই দূরের দিকে চেয়ে পাণ্ডাঠাকুর বলে, তোমার স্বামীর পয়সা হোক।

উষা পাণ্ডাঠাকুরের মনের কথা জানে না। কেই বা কার মনের কথা জানতে পারে। উষা আশ্চর্য হয়ে ভাবে, অপ্রার্থিত যে

আশীর্বাদ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ঠাকুরভাইয়ের মুখ থেকে বেরিয়েছে কী অদ্ভুতভাবে তা সত্য হল। তার মনে হল, আন্তরিক আশীর্বাদ কখনও বিফলে যায় না। কিন্তু উষা পরম বেদনার সঙ্গে ভাবে, আশীর্বাদ ফলে ; কিন্তু যেমন করে ফলা উচিত তেমন করে ফলে না। ভগবান কী সুন্দর গোলাপ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তার গায়ে বিষের মতন জ্বালা করা কাঁটাও দিয়েছেন। সে কাঁটার খোঁচায় না জ্বলে, না যন্ত্রণা পেয়ে কেউ সে ফুল তুলতে পারে না। উষা ত তা চায় নি। তবে এমন করে কেন দিলে? সচ্ছলতার সঙ্গে জ্বালা? মা আমাকে যদি তোমার ধনী করবারই ইচ্ছে, তবে এমন করে কেন মাথার ওপর তোমার তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গটা এমন সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলিয়ে রাখলে। এ ধন পেয়ে তবে কি সুখ মাগো, যদি এ খড়্গ কখন মাথার ওপরে অব্যর্থ লক্ষ্যে খসে পড়ে সে-ভয়ে অনুক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকি? আশীর্বাদী ফুলে পুরে একী শাস্তি তুমি দিলে। কেন অন্য আশীর্বাদ করলে না। যা অর্থের চেয়ে বড়। সংসারে সব পাওয়ার চেয়ে বড়। 'তোমার একটি ফুটফুটে ছেলে হোক' এ আশীর্বাদ কেন করলে না মা। সে যে সাতরাজার সমস্ত ধনের চেয়ে বেশি।

কিন্তু সে আশীর্বাদ কেন করছে না ঠাকুরভাই? তুমি সে আশীর্বাদ করতে কেন বলছ না তাঁকে? আমার স্বামী নিদারুণ ভয় মাথায় করে আমার জন্যে টাকা আনবে। আমাকে সে কত দেবে! সাড়ি দেবে। গহনা দেবে। ঘরে ফ্যান থাকবে। রেডিয়ো থাকবে। আমাকে সে রানী করবে। কিন্তু আমি তার জন্যে কী কিছু করতে পারব না মা? আমি যদি তার কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে তুলে না দিতে পারলাম মা, তাহলে স্বামীর স্নেহের অত সব দান আমি কেমন করে দুহাত ভরে নেব?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উষার ভয় কেটে গেল। মা-ই যেন সাহস দিল তাকে।

প্রায় বছর ঘুরে এল বিয়ে হয়েছে তাদের। তবু তার পেটে আজও সন্তান এল না কেন? তবে কী তার শরীরে তার পাপ ব্যবসায়ের কোন দুষ্ট ব্যাধি এখনও বাসা বেঁধে আছে? তার সন্তান হবে না। তাই কী মা তাকে সন্তান হবার আশীর্বাদ করছেন না? সে নিত্য ভাবত ডাক্তার দেখাবে। হাসপাতালে যাবে। কিন্তু সাহস করেনি। ভয় পেয়েছে। পাছে বুঝে ফেলে ডাক্তার। তার চরিত্র চিনে ফেলে। তাকে নিন্দে করে। ঘৃণা করে। তুচ্ছ করে।

এখন অভাবিত দুঃসাহসে ভরে উঠল ঊষার মন। মা-ই যেন অভয় দিল।

সন্তান কামনায় বিধুর ঊষার মন থেকে কখন অন্ধকারের ভয় উবে গেল। ভোরের বাতাস তার মাথায় নরম হাতের সেবা দিয়ে এক সময়ে তাকে এক অনাস্বাদিত সুখের স্বপ্নে ডুবিয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়ল ঊষা।

খ

পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই রমেশের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ না চেয়েই বুঝল, ঊষা তাকে প্রণাম করছে।

এ কাজটি ঊষা বিয়ের প্রথম রাতটি থেকেই করে আসছে। প্রথম ভোরে যেদিন সে তার পায়ে হাত ছোঁয়াল, নিঘুম রাতের শেষে রমেশ তখন অবসন্ন দেহে আচ্ছন্নের মতন পড়ে ছিল। ফুলশয্যায় রাতের প্রথম ভাগ কেটেছিল নানা বয়সী কয়েকটি মেয়ের হাসি তামাসায়। ভীড়ে। দ্বিতীয় ভাগ কেটেছে একটি অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা অর্জনের উন্মত্ত নেশায়। তাই আর ঘুমোবার

সময় পায়নি রমেশ। পায়ে হাত পড়তেই হকচকিয়ে উঠে বসেছিল। পায়ের কাছ থেকে উষাকে বুকের কাছে টেনে এনেছিল।

উষা বলেছিল, 'ছিঃ কে দেখে ফেলবে। ছাড়।'

রমেশ বলেছিল, 'পায়ে হাত দেবে না বল।'

যাকে সে বুকে ভরে রাখতে চায় সে পায়ে লুটবে কেন? রমেশের ভাল লাগত না। রমেশের কেমন যেন লাগত।

কিন্তু উষা ছাড়ে না। সে বলে, 'সারারাত কতবার হয়ত ঘুমের ঘোরে গায়ে পা দিয়েছি। প্রণাম না করলে অপরাধ হবে যে।'

রমেশ তাকে অনেক বুঝিয়েছে। ওতে কিছু হয় না। ওটা অপরাধ নয়। তা ছাড়া আমি যখন দোষ ধরছিনে তুমি অপরাধ ভাবছ কেন?

'অত তর্ক জানিনে', উষা হেসে জিদ ধরেছে, 'স্বামী দেবতা, তাকে প্রণাম করতেই হয়। নাও, আমার কপালে পা ছোঁয়াও। নয়ত ছাড়, আমি তোমার পায়ে মাথা ছোঁয়াব।'

অনেকদিন পর্যন্ত রমেশ এরকম প্রণাম নেওয়ার সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বড্ড অস্বিস্তি বোধ করেছে। আর সে অস্বস্তি কাটাতে উষা প্রণাম করে দাঁড়ালে সে তাকে চুমু খেয়েছে।

এখন সে সংকোচ সে অস্বস্তি নেই আর। অভ্যাসে সয়ে গেছে। স্বাভাবিক হয়ে গেছে। গতানুগতিক। এখন আর রোজ উষাকে চুমুও খায় না রমেশ। উষাও তাকে ঘুম ভাঙানো প্রণাম আর করে না আজকাল। পায়ে হাত ছুঁইয়ে সে হাত কপালে ঠেকিয়ে বিছানা ছাড়ে উষা। তাই সবদিন টেরও পায় না, উষা কখন উঠে যায়। রমেশ ঘুমন্তই থাকে অনেকদিন। উষা ওঠে পাঁচটায়, কি তারও আগে। রমেশ ঘুমোয় সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত। আরও সকালে যদি ওঠে ছ'টার আগে জাগে না কখনো।

আজ তক্তপোষ থেকে নেমে পায়ে মাথা ঠেকাল উষা, সেই

প্রথম দিনকার মত। সেদিনকার মত মাথার পরে বুক ঠেকাল পায়ে।

আজকের প্রণামটা নিত্য কর্মের মত নয়। গতানুগতিক নিয়ম রক্ষা মাত্র না। রীতিমত ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। এ প্রণাম যেমন আকস্মিক তেমনি অর্থপূর্ণ।

আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল রমেশের মন। অহংকারে বুক স্ফীত হল। টাকার লোভ কেউ সামলাতে পারে না, ভাবল রমেশ। হাতে টাকা পেলে কেউ ফেলে দিতে পারে না। বরং হাত থেকে ফসকে যাবার ভয়ে মুঠো আরো শক্ত করে ধরে। টাকায় নোংরার গন্ধ থাকলেও গ্রাহ্য করে না। সংসার-বিরাগী মঠ-মন্দিরের মোহন্ত পুরুতরাও না। সংসারীরা ত নয়ই। রামায়ণের রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন করত। সেই দস্যুবৃত্তির অন্ন খেতে তার বউ ছেলে বাপ মা বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে নি। উষাও করবে না।

তার টাকার সঙ্গে অপঘাত মৃত্যুর ভয় জড়িয়ে আছে জেনে হঠাৎ ভয়ে আঁৎকে উঠে উষা টাকাগুলি ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বটে, ফেরৎ দিয়ে দিতে বলেছিল বটে টাকাগুলি; কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে এ কাজ করতে বারণ করেছে সত্য; তবু সেই টাকাই বালিশের তলায় করে শুয়েঃ টাকার সঙ্গে জড়ানো প্রাণান্ত বিপদের ভয়টা থেকে টাকার সঙ্গে জড়ানো সচ্ছল আরামের স্বাদটাই বেশি করে পেয়েছে। যে অভাব এতদিন তার চোখে পড়ে নি। যে অভাবকে এতদিন সে গ্রাহ্য করে নি। যে দুঃখ দারিদ্র্যকে সে সারাজীবন সইবে বলে প্রস্তুত, বইবে বলে শক্ত করেছিল মনটাকে—সেগুলিই সারারাত তাকে খুঁচিয়েছে, আঘাত করেছে, চোখ লাল করে শাসিয়েছে। অভাবগুলিকে অসহ্য মনে হয়েছে তখন। অভাব পূরণের সুযোগ অবহেলা করাকে আহাম্মুকী মনে করেছে। নিজেকে এই

বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, স্বামী যদি বিপদ মাথায় করে তাকে সুখী করবার জন্যে টাকা রোজগার করতে ভয় না পায়, সে-টাকায় সুখী হতে সে কেন সংকুচিত হবে। স্বামী টাকা আনবে, অনেক টাকা। তাকে সুখী করবে, রানী করে রাখবে। কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে গেছে। মাথা নুইয়ে পড়েছে। তাই এমন করে প্রণাম করছে উষা। উষা আজ বুঝি সত্যি সত্যি তাকে ঈশ্বর ভাবছে। যে টাকা এনে দেয়—অঢেল টাকা। যে সুখে রাখবার প্রতিশ্রুতি দেয়—ঢালাও প্রতিশ্রুতি—সে ঈশ্বর ছাড়া কি! রমেশ আজ উষার ঈশ্বর। এই সুখ-চিন্তাটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে ভোগ করবার জন্যে অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল রমেশ। এমন সুখ-চিন্তাকে চোখ বুজে উপভোগ করতে হলে অন্ধকার প্রয়োজন।

কিন্তু তেমন অন্ধকার আর নেই। সকালের রোদ বেনো জলের মত খোলার ঘরের ফাঁক ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু রমেশ চোখ বুজল।

'শোন।'

'আঃ।'

সুখ-চিন্তায় বাধা দিচ্ছে উষা। রমেশ বিরক্ত হল।

'আমি মন্দিরে যাচ্ছি।'

'যাও না।' ভ্রূ কুঁচকে বলল রমেশ।

'আমি কিন্তু অনেক খরচ করে পূজো দেব, ভুজ্যি দেব।'

'দাও না।'

তখনও বিরক্তি রমেশের গলায়।

'শাঁখা সিঁদুর কিনব।'

'বেশ ভাল দেখে একখানা সাড়িও কিনো, সাড়ি ব্লাউজ সায়া গণেশ কাটরায় পাবে সব। পাশেই মনোহারি দোকান আছে। আলতা সেণ্ট স্নো পাউডার সব কিনো। কিছুই ত তোমার নেই।

ক্রমশ গলা সরস হল রমেশের, বিরক্তি কেটে গেল, মেজাজ শরিফ হল। উচ্চারণে খুশি কাঁপছে। 'হে পৃথিবী শোন' গলায় যেন রমেশ নয়, ঈশ্বর কথা বলছে।

রমেশের দরাজ গলার স্বরে সুখে হাসল ঊষা। কিন্তু বুক ভরে সুখ উপচে উঠল না। বুকের আধখানা জুড়ে হিংস্র পশুর মত একটা ভয় চোখে নীল শিখা জ্বেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেঁপে উঠল ঊষা। আস্তে হাতে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কাঁপা পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঊষা মন্দিরে গেল না। মন্দিরে যাবে পরে। মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে, গলায় আঁচল দিয়ে, হাতজোড় করে মাকে প্রণাম করে গেল। ঊষা সোজা এসে হাজির হল চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। খোঁজ-খবর নিয়ে এক জায়গায় টিকিট করাল ঊষা। আর এক জায়গায় এসে বসল। তারপর শুরু হল তার অস্থির উদগ্রীব প্রতীক্ষা। কী হয়েছে তার। কী বলবে ডাক্তার। ভেবে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি পেরিয়ে আসতে ঊষা যখন প্রায় বিবর্ণ, দম ফুরোনো ঘড়ির মত মুমূর্ষু হয়ে এসেছে তখন তার ডাক পড়ল। ধক্ করে উঠল বুক। উঠে দাঁড়াতে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। কিন্তু টালমাটাল হতে দিল না সে নিজেকে। পা ঈষৎ ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে এসে থামল ডাক্তারের সামনে।...

গ

…হাতটা কেঁপে গেল উষার। চোখের পাতায় কাজলের রেখাটা বুঝি লেপটে গেল। ভাবতে এখন উষার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ডাক্তার বললেন, 'আপনার স্বামী ত সন্তান চান না। সন্তান হলে তিনি আপনার ওপরে খুশি হবেন না।'

উষা অবাক হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়েছিল। এ কী বলছে ডাক্তার! ডাক্তার তার স্বামীকে চেনে নাকি? কবে তার স্বামী ডাক্তারকে এ কথা বলতে এল। উষা যে এই হাসপাতালে এই ডাক্তারের কাছেই চিকিৎসার জন্যে আসবে তাই বা তার স্বামী জানবে কি করে?

উষার দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখে ডাক্তার বলেছিলেন, 'সে কি, আপনি জানেন না? আপনাকে না বলেই কি আপনার স্বামী আপনার সন্তান না-হবার ব্যবস্থা করেছিলেন?'

উষা তখন বুঝেছে। অনেকদিন পরে আর একবার তার মায়ের চিকিৎসক সেই শয়তান ডাক্তারের হিংস্র চেহারাটা মনে পড়েছে। তার শরীরে সেই কিছু করে থাকবে। সে ছাড়া আর কেউ কিছু করতে পারে না। তার বেদনাবিদ্ধ দেউলে অতীত জীবনটার উপরে উষা একবার তার চোখ বুলিয়ে দেখেছে।

শেষে ডাক্তারকে বলেছে,—'আমার স্বামী আমাকে বলেছেন, এখন সন্তান হলে তিনি খুশি হবেন। তিনিই ত আমাকে হাসপাতালে পাঠালেন।'

মিথ্যে হলেও না বলে উপায় ছিল না। ধরা পড়ার ভয়ে কেঁপে উঠেছে উষা। নিন্দিত হবার ভয়ে মাথা নিচু করেছে।

'তা হলে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আপনার সন্তান হবে।'

তার শরীর থেকে, চিমটে মতন চুলের কাঁটা যদি আর একটু মোটা হয় আর তার মাথায় কোটের বোতাম মতন একটা আঁটা থাকে ত যেমন দেখায় তেমনি একটা জিনিস বের করে তাকে দেখিয়ে ডাক্তার বলেছিলেন 'আপনার স্বামীকে বলবেন, এসব যন্ত্র দিয়ে জন্ম-শাসন ভাল নয়। আপনার যে বিপদ ঘটেনি ভাগ্য।

সেইটে বের করে দেবার পর মুহূর্ত থেকে উষার সে কী স্বস্তি বোধ। তখন সে টের পেল, অনুক্ষণ তার তল পেটে একটা ভারবোধ আর বোবা যন্ত্রণা থাকত। বুঝতে পারল, কেন তার এতদিন কোন পুরুষ সহ্য হত না। ভাল লাগত না। তার স্বামী, যাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সর্বস্ব দিয়ে পুজো করে, বিশেষ সময়ে তাকেও কেন অসহ্য লাগত।

এখন তার শরীর কী হাল্‌কা কী সুস্থ! ডাক্তার বলেছেন, এখন তার সন্তান হবে। উষা হাসপাতাল থেকে যেন হাওয়ায় ভর করে মন্দিরে এসেছে। পাঁচ টাকার প্যাড়া কিনে মাকে ডালা দিয়েছে। সাতপাক মন্দির ঘুরে মাকে প্রণাম করেছে। চাল-ডাল-তেল-নুন তরকারি-মাংস-মিষ্টিতে এক ঝাঁকা ভুজ্য দিয়েছে ঠাকুরভাইকে। পাঁচ টাকার একটা নোট পায়ের ওপরে রেখে পায়ের ধুলো নিয়েছে। পাণ্ডাঠাকুরের চোখ তখন লোভে আতস কাঁচের মত জ্বলছিল। এত বড় ভুজ্য এতগুলি টাকা কেউ কোনদিন তাকে দিয়েছে কিনা মনে করতে পারছিল না। আজ দিদিকে অন্য রকম আশীর্বাদ করতে হবে। নতুন আশীর্বাদ। এই মস্তবড় ভুজ্যের সঙ্গে এই পাঁচ টাকা প্রণামীর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাবে এমন আশীর্বাদ। তার পৈতের দিকে তাকাল পাণ্ডাঠাকুর। বেশ পরিষ্কারই আছে পৈতেটা। খুশি হল। এসব সময়ে পৈতে নোংরা থাক্‌লে বিচ্ছিরি দেখায়। আশীর্বাদের অর্ধেক তেজই যেন কমে যায়।

উষার ভক্তি-নম্র মাথা পাণ্ডাঠাকুরের পায়ে পড়ে আছে। থাকুক। আজ পাণ্ডাঠাকুর ভুরু বাঁকাবে না। সে বিরক্ত হবে না। পাঁচ টাকা দামের প্রণাম শেষ হতে একটু সময় লাগবেই ত, ততক্ষণ সে ধৈর্য ধরে থাকবে।

ঠাকুরভাইয়ের পায়ে অনেকক্ষণ মাথা রেখে প্রার্থনা করল উষা। তারপর মাথা তুলে পায়ের ধুলো মাথায় জিভে বুকে লাগাল।

তখনই উষা দেখেছিল। আশীর্বাদের আশায় ঠাকুরভাইয়ের চোখে চোখ পেতেছিল। দেখেছে, স্বর্গের আলো জ্বলছে সেখানে। মায়ের মুখের হাসিটিই যেন ঠাকুরভাইয়ের মুখ ছেয়ে আছে।

এইবার সময় হয়েছে। পাণ্ডাঠাকুর দণ্ডায়মান অমিতাভ মূর্তির মতন স্থির। হাত তুলে প্রস্তুত। উষার অর্চনা শেষ হলে পাণ্ডাঠাকুর উষার মাথায় আশীর্বাদের মত করে হাত রাখল। মাথায় হাত রেখে শান্ত গভীর করুণায় মন্ত্রপাঠের মতন উচ্চারণ করল, 'পুত্রবতী হও দিদি। কোল উজ্জ্বল-করা পুত্র হোক তোমার।...'

...পেছনে ঠেকাঅলা সদ্য কেনা আয়নাখানা জলচৌকির ওপরে। মাটিতে হাঁটু ভেঙে গোড়ালির ওপরে বসে এখন উষা গালে পাউডার মাখছিল। তার হাত থেমে গেল। পাউডারের সাদা ছাপিয়ে রক্তের আভা ফুটে উঠল মুখে। চোখ বুজল উষা।

কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! ঠাকুরভাই ত জানে না ডাক্তার কী বলেছে। তবে? আজ এই নতুন আশীর্বাদ তবে কেন করল ঠাকুরভাই। এ আশীর্বাদ ত সে কোনদিন করে না। করেনি। তাহলে এ নিঃসন্দেহে ঠাকুরভাইয়ের মুখ দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ। মা অন্তর্যামী। মা সব জানেন। জেনেশুনেই তিনি এ আশীর্বাদ করেছেন। মায়েরই আশীর্বাদ। মায়ের হাসির আলো সে ঠাকুরভাইয়ের মুখে দেখেছে। তার সন্তান হবে। ছেলে হবে।

ছেলে হবে। ছেলে। আঃ কী সুখ! কী সুখ! উষা

সামনের আয়নাটাকেই দু'হাতে গালে চেপে ধরল। শীতল মসৃণ কাঁচটাকেই আদরে আদরে আর্দ্র করে দিতে লাগল।

দুপুরবেলা রমেশ যখন খেতে এসেছিল, মায়ের প্রসাদ দিতে দিতে, দিয়ে তখন উষা তাকে সব দেখিয়েছে। স্নো পাউডার সেণ্ট শাঁখা সিঁদুর। পুজো ভুজ্য দক্ষিণার কথা বলেছে।

শুধু যে-কথা সব আগে বলতে হত, বলতে পারলে তার বুক হাল্‌কা হত, যে-কথা বলতে তার ভীষণ ইচ্ছে করছিল, সে-কথাই বলতে পারেনি। কী আশীর্বাদ করেছে তাকে ঠাকুরভাই সে-কথাই উচ্চারণ করতে পারেনি উষা, উচ্চারণ করতে পারেনি কী বলে দিয়েছেন তাকে ডাক্তার। সে যে হাসপাতালে গিয়েছিল সে কথাও সে বলতে পারেনি। অনেকবার চেষ্টা করেও না। কী একটা লজ্জা বারে বারে এসে তার মুখে হাত চাপা দিয়েছে। উষা লজ্জা-চাপা মুখে হেসে ভেবেছে, সময় যখন হবে, সে নিজেই জানতে পারবে। আকাশে চাঁদ উঠলে কে লুকিয়ে রাখতে পারে। তবে? আগবাড়িয়ে বলে কি লাভ। বরং লাভ ওঁর জন্যে একটা বিস্ময় লুকিয়ে রাখলে। গোপন করে রাখতেই ভাল লাগল উষার। মজা লাগল। মুখ টিপে হাসল। ভাবল, একদিন ওঁকে বলবে, 'আমার পেটে কান পাত ত।'

'কেন?'

'পাতই না।'

অদ্ভুত আবদার শুনে প্রথমে হয়ত গ্রাহ্যই করতে চাইবে না। বার বার আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে ভুরু কুঁচকোবে। বিরক্ত হয়ে কানটা এগিয়ে আনবে পেটের ওপরে। একটু থেমে, শেষে পেটে চেপে ধরবে। তখন সেখানে আর একটি ছোট্ট বুকের ধুকপুক শুনবে সে। শুনে কি হবে তার মুখের অবস্থা? বিরক্তি উবে যাবে। ছবিটা বিস্ময়ে একবার বাঁকা একবার টানটান হবে। চোখ ছোট

হবে প্রথম, তারপর বড়—খুব বড় হবে। হাঁ৷ হবে মুখ।—'কি বল ত, কী ব্যাপার?' শুধোবে। বোকা মানুষটা বুঝবে না। উষা তখন তার গলা জড়িয়ে ধরবে। কানের কাছে মুখ এনে…।

'বেশ, এ সব ত দেখলাম, সাড়ি কই? সাড়ি ব্লাউজ ত দেখালে না।'

স্নো পাউডার সিঁদুর সেণ্ট দেখতে দেখতে শুধোল রমেশ।

সাড়ি ব্লাউজ কিনবার টাকা নিয়ে গিয়েছিল উষা; কিন্তু রমেশের জামাকাপড় কিনবার আগে নিজের জন্যে কিনতে ভাল লাগেনি উষার; সে দোকানে পা দিয়েও ফিরে এসেছে। কত দোকানী মা মা বলে বার বার ডেকেছে, 'মা এদিকে আসুন, এদিকে।' উষা কান পাতেনি।

বলল, 'পুজো দিতে দিতে বেলা হয়ে গেল তাই ছুটে এলাম।'

'বিকেলে কিনে এনো।'

'তোমার জামাকাপড় আগে হোক তারপরে আমারটা।'

কমলা তার জন্যে জামাকাপড় কিনে রেখেছে। আজই আনতে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু আজ আর রমেশের সময় হবে না। তিলজলার দিকে একটা মাল পাচার করতে যেতে হবে।

বলল, 'আমার জামাকাপড় কাল কিনব। আজ সময় পাব না। সময় পেলে তোমার সঙ্গেই যেতাম। তোমার সাড়ি আমার কাপড় কিনে নিয়ে আসতাম। তুমি কিন্তু আজই কিনে এন। আজ রাতে এসে যেন তোমাকে নতুন সাড়িপরা দেখি। রমেশ উষার গাল টিপে দিল।

উষা দেখল রমেশের চোখে খুশি, আগ্রহ। বউকে সাজাবে।

আমি সাজব সেজেগুজে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, রমেশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল উষা। রমেশকে সুখী করবে সে। মনে মনে সুখ অনুভব করল উষা। হাসল।

অনেক দোকান ঘুরে অনেক সাড়ি ঘেঁটে এই একটু আগে সাড়ি সায়া ব্লাউজ কিনে ফিরে এল উষা। রান্নাবান্না সারল এসে। তারপর গন্ধ সাবান মেখে স্নান করেছে। পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। এখন প্রসাধন শেষ। লণ্ঠনের শিখাটাকে খুব বাড়িয়ে দিয়ে বার বার করে মুখ দেখল উষা। খুশি হল। বেশ দেখাচ্ছে মুখখানা। ফুলশয্যার রাতের মত সাজতে পেরেছে বলে তৃপ্তি পেল। এবার সাড়িটা পরলেই হয়। তার আগে গায়ে একটু সেণ্ট মাখলে ভাল হয়। গায়ে ছেঁড়া, বোতাম-খোলা ব্লাউজটা বগলে চলচল করছে। তার থেকে ভক্‌ভক্‌ করে ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে। পরনের আধভেজা কাপড়টা থেকেও বুঝি একটা হেঁসেলীগন্ধ উঠছে। উষা সেণ্টের শিশি খুলল। আঃ, কী সুন্দর গন্ধ। শিশিটা নাকের সামনে ধরে নিঃশ্বাস নিল উষা। নিঃশ্বাস নিতে নিতে আমেজে চোখ বুজল।

তির্‌তির্‌ একটি ক্ষীণ স্রোতের মত আধভেজান দরজার ফাঁক গলে সেণ্টের গন্ধটা ভেসে আসছে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রমেশ একটুক্ষণ গন্ধটা অনুভব করল। উষা বুঝি সাজছে। অথবা সেজেগুজে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফুলশয্যার রাতের মত নতুন করে আজ আবার পাবে উষাকে। সেদিনের থেকে বেশি করে পাবে। অন্যরকম করে পাবে। সেদিন দরিদ্র এক ফেরিঅলাকে উষা অনুগ্রহ করেছিল। রমেশ উষাকে পেয়ে ধন্য মনে করেছিল। সে জমানা পাল্‌টে গেছে। আজ আর রমেশ দরিদ্র ফেরিঅলা নয়। ধনী। ধনী হতে চলেছে। আজ রমেশই উষাকে অনুগ্রহ করবে। উষা তার ইচ্ছার পায়ে লুটিয়ে থেকে ধন্য হবে। রমেশ ধন্য করবে উষাকে। উষা বলে স্বামী দেবতা। আজ রমেশের মনে হল, সত্যি। সত্যি সে তাই। উষার ঈশ্বর। ছবিতে দেখেছে, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার চোখ টিপে ধরেছে। ঈশ্বর-

ভাবে সে ছবিটা এখন মনে পড়ল রমেশের। নিঃশব্দে ঢুকে উষার চোখটা টিপে ধরলে কেমন হয়। চিন্তা করে রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হল। এক রকমের শারীর-সুখ শিরদাঁড়া বেয়ে মাথায় এসে অধৈর্য হল।

চুপ-পায়ে ঘরে ঢুকল রমেশ। অন্ধকার-অন্ধকার কোণটায় দাঁড়িয়ে তাকাল।

এসেন্স-গন্ধে এক গাঢ় নেশায় চোখ ঘুম ঘুম হয়েছে উষার। চোখ না মেলে গন্ধটা গায়ে ঢালছে; তখন আধবোজা চোখে দেখে একটা মানুষ। একটা মানুষের ছায়া। আধবোজা চোখ মুহূর্তের জন্যে বিশাল হয়ে আরও বুজে গেল। কেঁপে উঠল উষা। চিৎকার করে উঠল।

'চোর—চোর।'

ভয়ে নিঃস্বর গলা দিয়ে ফ্যাসফ্যাস মতন অব্যক্ত একটা আওয়াজ বেরোল।

চোখ টিপে ধরা আর হল না। উষা ভয় পেয়েছে। রমেশ ওর নিকটে এল।

'আরে আমি আমি।'

'তুমি! আচ্ছা, এমন করে ভয় দেখাতে হয় মানুষকে। ছাখ আমার বুকের মধ্যে কী করছে।'

উষা রমেশের হাতটা বুকে চেপে ধরল।

'উঃ, উ-উ, অসভ্য।'

উষা পেছনে হটে গেল।

রমেশ চাপা গলায় হেসে উঠল। হাত বাড়িয়ে আবার ধরতে গেল উষাকে।

একটু আগের ভীত একটু পরের বিব্রত উষা এখন সুস্থ সুন্দর

একটু হেসে বলল, 'লক্ষীটি একটু বাইরে যাও। এই নোংরা কাপড়-চোপড়গুলি ছাড়ি।'

'তোমার সাড়ি ব্লাউজ কিনেছ ত ?'

'হ্যাঁ, এখন সে সব পরেই ত তোমাকে প্রণাম করব।'

'বেশ ত পর।'

'তুমি বাইরে না গেলে কাপড় ছাড়ি কী করে !'

'সে কি, আমার সামনে কাপড় ছাড়তে পার না ?'

'ধ্যাৎ।'

'ধ্যাৎ কী ! দাও আমিই পরিয়ে দিচ্ছি।'

'যাঃ !'

লজ্জায় লাল হয়ে উষা সরে গেল এক কোণে।

রমেশ তাকে ধরে ফেলল। বোতাম-আলগা ঢলঢলে ব্লাউজটা টেনে টেনে এক রকম করে খুলে ফেলতে পারল রমেশ; কিন্তু উষা সাড়িটা শক্ত করে আঁকড়ে রইল। লজ্জায় অস্থির হয়ে ধমকে উঠল।

'আঃ ! দরজা খোলা। কী ! করছ কী !'

'রোস তবে, দরজাটা দিয়ে আসি।'

দরজায় খিল তুলে ফিরে তাকিয়ে রমেশ দেখে, উষা লণ্ঠনের চাবি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নিবিয়ে দিচ্ছে লণ্ঠনটা।

'এই, এই।'

রমেশ চেঁচিয়ে উঠল।

রমেশের চিৎকারে থতমত খেয়ে উষা চাবিটা ছেড়ে দিল। রমেশ ছুটে এসে চাবিটা আবার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল। নিবন্ত পলতেটা দপদপ করে উঠল।

উষা বসে পড়ল তক্তপোষের অন্ধকারে। কাকুতি জানাল, 'বাতি নেভাও লক্ষীটি, অন্ধকার কর।'

রমেশের রক্তে তখন উষার অর্ধনগ্ন দেহটা শিখার মত জ্বলছে। লণ্ঠনের দপদপে শিখাটার মত। সে উষার কাকুতিতে কান দিল না। সে উষাকে টেনে তুলল। উষা তার সাড়িটা কোনমতে জড়িয়ে রেখেছিল কোমরে। জোর জবরদস্তি করে সাড়িটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল রমেশ। আর উষার নিটোল নগ্ন নরম দেহটা দেখল মুহূর্তের জন্যে।

অতি বাড়ন্ত পলতেটার থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। ধোঁয়ার মেঘে দেখতে দেখতে কাচটা ঢাকা পড়ে গেছে। দপদপে আলোটা মরা হলুদ রঙ ধরেছে। কিন্তু উষার গায়ে লুটিয়ে পড়ে সেই মরা হলুদ রঙই যেন সোনা হয়ে গেল। এমন রূপ দেখেনি রমেশ। এমন দৃশ্য না। কড়া মদের নেশায় যেমন হয়, ঝিম করে উঠল মাথাটা।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উষা রমেশের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে তার থুতনির তলায় মাথা গুঁজল। এভাবে রমেশের চোখের সামনে থেকে নিজের নিরাবরণ শরীরটাকে লুকোতে পেরে স্বস্তি পেল উষা। রমেশ তাকে ছাড়াতে চাইল। বুক থেকে আলগা করে চোখের সামনে ধরতে চাইল। চোখ ভরে দেখতে চাইল। কিন্তু উষা তাকে কিছুতে ছাড়ছে না। অগত্যা তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে দেখতে লাগল রমেশ। আঙুলে আঙুলে তাকে আবিষ্কার করতে লাগল, মনের মধ্যে এঁকে এঁকে দেখতে লাগল তাকে।

উষাকে এমন করে পায়নি কখনো রমেশ। এমন করে পাওয়ার মধ্যে যে উন্মত্ত উত্তেজনা আছে জানত না রমেশ। নতুনতর এক উত্তেজনার স্বাদে আর্দ্র হয়ে গেল রমেশ। সেও দুহাতে উষাকে এবার নিবিড় করে ধরল। দুটি দেহ ক্রমশ ঘন ঘনতর হয়ে একাকার হয়ে গেল।

…উষা স্বপ্ন দেখছিল, সে এক উত্তাল সমুদ্র-ঝড়ে ভাসছে। তার শরীরের রক্তকণাগুলি সে ঝড়ো ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে কখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে, কখনো জড়ো হয়ে পিণ্ড হচ্ছে। কাদা-নরম রক্তের পিণ্ডটা এক এক সময়ে যেন পুতুল হয়ে যাচ্ছে। সুন্দর নরম তুলতুলে পুতুল। তার ছোট্ট বুকটা পাখির বুকের মত ধুকপুক করছে। উষা গহন সুখে শক্ত হচ্ছে, সমুদ্র ঢেউকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরছে, পিণ্ডটা—পুতুলটা—যেন আহত না হয়, ভেঙে না যায়। কাঠ-কাঠ হতে হতে এক সময়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্লান্ত, সমুদ্র-জলের উষ্ণতায় সুখী উষা পরম আলস্যে এলিয়ে পড়ল। জীবনের পরম রমণীয় স্বপ্নটাই যেন আচ্ছন্ন আবৃত করে ফেলল তাকে। এক সময়ে সমুদ্র-শরীরে নিশ্চেষ্ট আরামে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল উষা।

তিন

বেহালার ট্রাম থেকে নেমে নিউ আলিপুরের পথে একটু হাঁটলেই 'কিউ' প্লটের ওপরে আকাশী রঙের তিনতলা বাড়ি। কী বাড়ি। যেন পরীর প্রাসাদ। এখানে ওখানে রঙিন টবে বাহারী গাছ। ফুল। লতা। জানলায় দরজায় রঙিন কাচ। ছবি আঁকা পর্দা। তিনতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটটায় থাকে কমলা। তার জানলায় নীল পর্দা উড়ছে নাকি চোখ টিপে ডাকছে। রমেশ তার হাফশার্ট পায়জামা চটির দিকে তাকাল। কোনটাই এ বাড়িতে ঢোকার মত পরিষ্কার নয়। চোর ভেবে কুকুর ডাকবে নাকি। দারোয়ান আটকাবে নাকি গেটে। রমেশ ভীরু পায়ে নিকটে এল। কেউ কোথাও নেই। মানুষ না। কুকুর না। লোহার প্রকাণ্ড গেটটা আধখোলা। যেন সে ঢুকবে বলেই কেউ খুলে রেখেছে। সাহসে ভর করে ঢুকে গেল রমেশ। সামনেই সিঁড়ি যেন হাত বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করছে। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল রমেশ। বন্ধ দরজার গায়ে লেখা ফ্ল্যাট নং ৬। এতক্ষণে রুদ্ধ দমটা ছাড়ল রমেশ। নিশ্চিন্ত হয়ে কড়াটা ঠুকঠুক করে নেড়ে দিল। মনের মধ্যে দুরদুর করা একটা ভয় জড়ানো জড়তার দিকে চেয়ে অথবা কমলার সঙ্গে দেখা হবে সেই সুখে রমেশ মুখ টিপে একটু হাসল। বুকের মধ্যে রাশীকৃত উত্তেজনা। সে-উত্তেজনা কাটিয়ে উঠবার আগেই খুট করে দরজা খুলে গেল। স্বল্প বিভক্ত দরজার মধ্যে কমলা। বুকের মধ্যে উৎলান রক্তের উত্তেজনাটা মুহূর্তে মিইয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল রমেশের।

রমেশের হিম চোখের দিকে তাকিয়ে কমলা বলল,—'কী আজও চিনতে পারছ না?'

না। এ কী তোমার চেহারা। পার্কে ময়দানে যার চেহারার জৌলুসে পুরুষগুলো পোকার মত এসে জড় হয়। অপ্‌সরী বলে ভুল করে যাকে পকেট উজাড় করে মুহূর্তের জন্যে হলেও কিনতে চায় মানুষ, একি তার চেহারা! একি সেই কমলা! তুমি কি সেই কমলা! কাল যাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলাম অপ্‌সরী! আটপৌরে একটা সাড়ি পরে গৃহস্থ ঘরের একটি সাধারণ মেয়ের মত তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ। এলোমেলো চুল। আলুথালু সাড়ি। ফ্যাকাসে মুখ। নিবন্ত চোখ। এখন তোমাকে দেখে আমার একবিন্দু উত্তেজনা নেই। তুমি আমার উষার চেয়ে ময়লা। ফ্যাকাসে। উষা ত সারাক্ষণ এই রকমই থাকে। তার সাড়ি থাকে ভীষণ ময়লা, নানা জায়গায় ছেঁড়া। ব্লাউজের কী রঙ ছিল একদিন তাও বোঝা যায় না। চুলে তেল থাকে না। রুক্ষ চুলগুলি কেবল নাকে মুখে জড়ায়। তবু তাকে কত ভাল লাগে। পুকুর-পুকুর দুটো চোখ। বেতফলের মত চোখের তারা। চোখ তুলে যখন তাকায় মনে হয় তক্ষুনি বুকে টেনে নিই। এখন তোমাকে দেখে তেমন কিছু মনে হচ্ছে না আমার। নিবন্ত প্রদীপের মত চোখ তোমার, শুক্‌ন পুকুরের মত মুখ, আদৌ টানছে না আমাকে।

এমন দুরদুর বুক নিয়ে কেন যে ছুটে এসেছে রমেশ এখন ভুলে গেল। আর একদিন সময় করে আসব বলে চলে যাবে নাকি রমেশ। দু মুহূর্ত চিন্তা করল। শেষে মৃদু শান্ত একটু হাসল।

'এই কি কালকের সেই অপ্‌সরী নাকি যে চিনব?'

'তোমাকেও কি গায়ে রঙ মেখে ভুলোতে হবে নাকি? এস।' দরজাটা আরো খুলে দিয়ে বলল, 'সেজেগুজে তুমিই বা কোন কার্তিকটি হয়ে এসেছ। এই ত পোষাকের শ্রী! বুঝি স্নানও

করনি। কী রুক্ষ চেহারা, মাগো!' কমলা একটু আদুরে মৃদু হাসি হাসল। তারপর এগিয়ে গিয়ে একটা আলমারীর কাছে দাঁড়াল।

কমলার হাসিটি রমেশের ভারি ভাল লাগল। ভাল লাগল তার কথাগুলিও। কমলার কথাগুলির পথ বেয়ে যেন তার হৃদয়ের দুয়ারে এসে দাঁড়াতে পারল রমেশ। অনুভব করতে পারল কমলার ভালবাসা মেকি নয়। তাই নকল রঙ মেখে তাকে নটির মত অভ্যর্থনা করার কথা ভাবেনি কমলা।

কমলাকে দেখতে দেখতে ঘরে ঢুকল রমেশ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ঘরখানি তার মন কেড়ে নিল। অবাক হয়ে দেখতে লাগল রমেশ। একপাশে মস্ত একটা খাট, বিছানা—চোখের দৃষ্টির চাপেই বসে যায় যেন, উতলান দুধের ফেনার মতন এমন ফুলো নরম আর সাদা। আর একপাশে তেমনি নরম ফুলো ফুলো গদীর সোফা সেট। এক দেয়ালে সুন্দর একটি কাচ বসান আলমারী। কাচমোড়া তাক দুটোতে টুকিটাকি নানা শৌখীন সামগ্রী। তার নিচে দেরাজ। কমলা এখন সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে কী করছে। আর এক দেওয়ালে মস্ত আরশি আঁটা সাজবার টেবিল। এক জায়গায় কমলার মস্ত একখানা ছবি। মনেই হয় না কমলা। মনে হয় কোন নামকরা অভিনেত্রী। আর এক জায়গায় কোন শিল্পীর আঁকা চড়া রঙের সূর্যাস্তের চিত্র। ছিমছাম পরিপাটি করে সাজান গোছান ঘর। যে অপ্সরীকে কাল সে পার্কে দেখেছে এ ঘর যেন তারই জন্যে। তারই উপযুক্ত। যে-কমলা তার সামনে এখন একটা লাটকরা সাড়ি পরে আছে, শুকনো ফ্যাকাসে বাসি ফুলের মতন দেখাচ্ছে যাকে, তার জন্যে নয়। এ ঘরে থাকবার যোগ্য নয় সে।

কমলা এক প্রস্থ জামা কাপড় নিয়ে এসে বলল, 'চান করবে এস। আচ্ছা, এত বেলা পর্যন্ত কী করছিলে, তোমাকে না বলেছিলাম দুপুরে আসতে।'

'এখন কি বিকেল নাকি ?'

'বেলা ছুটোকে কেউ ছুপুর বলে নাকি ? তোমার জন্মে অপেক্ষা করে করে শেষে আমি খেয়ে নিয়েছি। বাকী সব ঝি নিয়ে গেছে। তুমি না খেয়ে থাকবে।'

'আমাকে তেমন বোকা পাওনি। যেই দেখলাম বেলা অনেক হয়েছে আমি একটা পাঞ্জাবীর হোটেলে ঢুকে পেটপুরে মাংস রুটি খেয়ে নিলাম।'

কমলা ফোঁস করে উঠল।

'বল কী, আর তোমার জন্মে রেঁধে বেড়ে সেই বেলা বারোটা থেকে বসে আছি। কালও বসেছিলাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত দেখে শেষে সেই শুকনো কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত খাই। আজও এখন অবধি খাইনি, বেশ লোক তুমি যাহোক।'

উষার স্বর যেন শুনল কমলার গলায়। মেয়েরা কখনো কখনো যেন সকলেই এক রকম। এই রকম।

রমেশ চমকে তাকাল কমলার মুখে। তার চোখের ভিতরে। চোখের তারাটি এখন উষার চোখের তারার মত কাঁপছে জ্বলছে। আজ বলে এসেছে উষাকে সে দূরে যাচ্ছে, বাড়িতে খাবে না। মেটিয়াবুরুজে একটা মাল পাচার করতে এসেছিল। না বলে এলে সেও এতক্ষণ না খেয়ে থাকত। বাইরে থেকে খেয়ে গেলে ভিজে গলায় ছলছল চোখে এমনি ফুঁসে উঠত।

কমলার মুখের দিকে চোখের মধ্যে তাকিয়ে থেকে এবার রমেশের বড় ইচ্ছে হল উষার মুখখানা যেমন করে ধরে ছুহাতের অঞ্জলির মধ্যে তেমনি করে ধরে কমলার মুখ।

কমলা যেন সে-নীরব বাসনা পড়তে পারল রমেশের মুখে। কাছে এল। বুকের কাছে। ধরুক রমেশ তাকে।

কিন্তু রমেশ তাকে ধরল না। রমেশ চোখ ফিরিয়ে নিল।

'কোথায় তোমার স্নানের ঘর ?'

কমলা হতাশ হল। হতাশ হয়ে সামান্য হাসল।

'এস.।'

বাথরুমে কাপড় জামা রেখে, তেল সাবান দেখিয়ে দিয়ে কমলা এসে গ্যাস স্টোভে কেৎলি চাপাল।

রমেশদাটা কী! ওর শরীরে কী তাপ জ্বালা বলে কিছু নেই? কেৎলিতে জল ঢালতে ঢালতে ভুরু কুঁচকোল কমলা।

'আঃ কী সুন্দর!'

কমলার ড্রেসিং টেবিলের ওপরে নুইয়ে আয়নায় এক একবার দেখছিল রমেশ আর কালো দীঘল ঘন চুলের মধ্যে প্রাণপণে চিরুনি চালাচ্ছিল। তেলে জলে খানে খানে চুলগুলি জড়িয়ে জট পাকিয়ে গেছে। শূন্যে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে মুখ খিঁচিয়ে সেই জট ছাড়াচ্ছিল রমেশ আর ঝুঁকে ঝুঁকে মুখ দেখছিল আয়নায়। দেখছিল চুলটা ঠিক পাট হল কিনা।

চুলটাকে বাগ মানিয়েছে রমেশ। চুলটা বেশ পরিপাটি হয়েছে। আয়নায় তাই দেখতে দেখতে সোজা হয়ে ঘাড় ফেরাল রমেশ।

কমলা ঘরে ঢুকেছে। তার দু হাতে ধরা একটা ট্রে। ট্রেটা সে সোফার পাশে টি-টেবিলে রাখল। প্লেট দিয়ে ঢাকা দিল চায়ের কাপটা। এক কাপ চা। পাশে একটা বড় প্লেটে কিছু বিস্কুট কেক।

'কী সুন্দর?' শুধাল রমেশ।

কমলা নিকটে এসে বলল, 'দেখবে এস।' খাটের শিয়রে একটা

নীল পর্দা। রমেশকে সেখানে নিয়ে এল কমলা। পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ।'

খাটের সমান চওড়া। প্রায় আধখানা দেওয়াল জুড়ে রমেশের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু প্রকাণ্ড এক আয়না। তার মধ্যে হাঁটুর নিচে থেকে মাথা অবধি নিজেকে দেখল রমেশ।

'দেখ, তুমি কত সুন্দর!' আকাঙ্ক্ষার চোখে আয়নায় তাকিয়ে রমেশের যৌবন দেখতে দেখতে বলল কমলা।

রমেশ কখনও নিজেকে দেখেনি। কেমন করে দেখবে? তার আয়না বলতে ত পারা-ওঠা একখণ্ড ভাঙা কাচ। তাতে করে কোন রকমে সে তার দাড়িটা কামায়। জুলপির দুটো কোণ কোন মতে দেখতে পেলেই হল। আর কিছু দেখতে হয় না। দেখবার দরকার হয় না। আন্দাজেই কামান যায়। কোদালের মতন ক্ষুর বের করে সাহেবরা এই বড় এক সুবিধে করে দিয়েছে।

চুল আঁচড়াতেও আয়না লাগে না রমেশের। সিঁথি কাটলে তবে ত আয়না লাগবে। আয়না নেই বলে তাই সিঁথি কাটার বালাই নেই তার। সামনে থেকে পেছনে চুল আঁচড়ায় রমেশ। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়েই বুঝতে পারে চুলটা পাটপাট হল কিনা। কিন্তু সে ক্বচিৎ কদাচিৎ। স্নান করে এসে কোন গতিকে চুলটাকে চিরুনির দু' চারটা টানে পেছনে উলটে দিতে পারলে হয়ে গেল। চুলের কথা তার পরে আর মনে রাখে না রমেশ। তরকারির ফড়েমি করে যে, যে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চা ফেরি করে, তার চুলের অত বাহারের দরকার কী। কী দরকার অত তদ্বির তদারকীর। চুল খুব বড় হয়ে গেলে দেড় মাসে দু'মাসে একবার রাস্তার পাশে নাপিতের সামনে বসে যায়। সেখানেও আয়নার বালাই নেই। নাপিত তার খুশি মত মাথার চুল খাটো করে দেয়। তারপর ছাঁটা মাথা দেখবার জন্যে আরশি বলে এক

চিলতে যে বস্তু হাতে দেয় নাপিত, তাতে একবারে নাকটা আর একটা চোখ বা শুধু নাকটা ছাড়া আর কিছু সে কোন দিন দেখেনি।

সে নাপিতকে বলে, 'থাক বাবা, তোমার আরশি রাখ। ওর দরকার নেই।'

পাশের কাউকে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন হল ভাই চুল ছাঁটাটা।'

বেশ বললে ত খুশিই হয় রমেশ। মন্দ না বললেও দুঃখিত হয় না। কারণ চমৎকার চুল ছাঁটাতে হলে সেলুনে ঢুকতে হয়। সে পয়সা তার নেই। সেলুনে কখনও রমেশ চুল ছাঁটায়নি। কিন্তু সেলুন দেখেছে। সেখানে অনেক আয়না। বড় বড় আয়না চারধারে। চেয়ার আছে। ফ্যান আছে। বেশ বাদশাহী ব্যবস্থা। ওখানে বসলে বোধ হয় চার ধারের আয়নায় গোটা মাথাটাই দেখা যায়। কিন্তু গোটা শরীর দেখা যায় এমন মস্ত আয়না সে এই প্রথম দেখল। সেদিন কমলার সঙ্গে কমলালয়ে ঢুকেও কয়েকটা বড় বড় আয়না দেখেছে রমেশ। কিন্তু তার একটাও এত বড় নয়।

নিজেকে সে এমন করে এই প্রথম দেখল। সমস্ত জামা কাপড় খুলে নিজের সত্যিকার শরীরটাকে একবার খুঁটে খুঁটে দেখতে ইচ্ছে করল রমেশের। তেমন করে দেখতে না জানি কেমন। নিজেকে দেখার একটা অদম্য পিপাসায় কাতরতা বোধ করল রমেশ। কিন্তু তাই বলে ধোপ ইস্তিরি দুরস্ত এই জামা কাপড় সজ্জিত নিজের রূপ দেখতেও কম ভাল লাগল না তার। নিজের এ রূপও সে দেখেনি কখনও। নিজেকে দেখতে যে এত ভাল লাগে তা জানত না রমেশ। নিজের মুখ দেখতে যে এত সুখ তাও জানত না।

কমলা পাউডার এনে তার ঘাড়ে গলায় মুখে বুলিয়ে দিল। আঁচল দিয়ে মুছে দিল মুখটা তারপর। পাউডার মুছে গেল, কিন্তু

তার হাল্‌কা সাদা একটা আভা রয়ে গেল। আর তাইতে তার মুখের ডৌলটা যেন অবাক মতন পাল্‌টে গেছে। পাঞ্জাবীর বুকের বোতাম এঁটে দিল কমলা। হাতের বোতাম লাগিয়ে দিল। কোন মতে কুঁচিয়ে যে কোঁচাটা সে কোমরের কষিতে গুঁজে ছিল কমলা তাকে কী সুন্দর পাটপাট করে দিল। বলল, 'দেখেছ? এখন দেখ, তুমি কি সুন্দর!'

সত্যি সুন্দর। আর একজন হয়ে নিজেকে দেখতে লাগল রমেশ। দেখতে লাগল আর ভালবাসতে লাগল।

'কেমন দেখছ?' শুধোল কমলা।

'বাবু! কী বল?'

কমলার দিকে তাকিয়ে হাসল রমেশ। তার চোখে মুখে সুখ কাঁপছে।

'ফুলবাবু, না!'

কমলা তার কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়াল। এখন দু'জনকেই আয়নায় দেখা যাচ্ছে; কিন্তু কমলাকে দেখছে না রমেশ।

'কমলা বলল, 'না। বাবু না। ফুলবাবুও না। নাগর।'

কমলা রমেশের বুকের মধ্যে আরও ঘন হয়ে দাঁড়াল। কমলার এক মাথা এলোমেলো চুলের ওপরে রমেশ নিজের মুখ দেখছে শুধু। কমলার শরীরে অবশিষ্ট শরীর তার ঢাকা পড়েছে। নিজেকে আর দেখতে না পেয়ে কমলাকে দেখছে এখন। কমলার পিঠ। সরু কোমর। বিস্তৃত নিতম্ব। মিহি জাফরানী রঙের দুমরানো কুচকোনো লাল সাড়িটাই আয়নায় এখন ভারি সুন্দর। আরও সুন্দর হয়ে প্রশস্ত নিতম্ব এখন সে-সাড়িতে টানটান জড়িত। তাই নরম আর মাংসল নিতম্ব এখন আরও বেশি করে স্পষ্ট ভারি আর প্রশস্ত।

রমেশের গা শিরশির করে।

কমলার নিঃশ্বাস ওর ঘাড়ে লাগছে। সে-গরম নিঃশ্বাসে রক্তের উত্তেজনা উৎলাচ্ছে অল্পে অল্পে।

কমলা বলল, 'প্রেমের নাগর তুমি আমার।'

কমলা দু' হাতে রমেশের গলা জড়িয়ে ধরল।

রমেশ ভ্রূ কুঁচকোল। নাগর। প্রেমের নাগর! ওরা যাকে ছোট করে বলে প্যানা। ঘৃণায় যার দিকে তাকিয়ে মানুষ নাক সিঁটকোয়। সেই প্যানা হবে নাকি রমেশ! কোন্ দুঃখে? রমেশের গা ঘিনিয়ে উঠল। কমলার গায়ের উত্তাপে, কমলার শরীরের বাসি গন্ধে, আয়নায় তার প্রশস্ত মাংসল নিতম্ব দেখে তার রক্তে যে উত্তেজনা ফেনিয়ে উঠছিল তা মরে গেল।

রমেশ বলল, 'এবার তুমি খাবে চল। তুমি আমার জন্যে এখনও না খেয়ে আছ।'

কমলাকে গলা থেকে ছাড়াতে চাইল রমেশ।

কমলা তেমনি থেকে বলল, 'এতক্ষণই গেছে যখন, আর একটু দেরী হোক। তোমাকে এখন ছাড়তে ইচ্ছে করছে না আমার।'

কিন্তু ছাড়তে হবে। তোমার বেড়িতে আমি আটকা পড়ব না। আমি কিছুতে প্যানা হব না তোমার। রমেশ ধাক্কা দিয়ে কমলাকে সরিয়ে দেবে। চিৎকার করে প্রতিবাদ করবে। কিন্তু কিছুই সে পারল না। সাপের শরীরের প্যাঁচের মতন কমলার দুটো বাহু রমেশের গলা সাপটে ধরেছে। রমেশের গলায় ফাঁসির রশি পরিয়েছে যেন কমলা। কমলার উষ্ণ নিঃশ্বাস রমেশের নাকে গালে ঠোঁটে। তার জ্বরো জ্বরো উষ্ণ পাতলা শরীরটা রমেশের গায়ে ল্যাপটানো। অনেক অনেক আগেকার স্মৃতি সত্যি হতে লাগল যেন একটু একটু করে। সেদিন কমলার এই উষ্ণ নিঃশ্বাস গালে গলায় লেগে তাকে পাগল করত, তার ইচ্ছে করত কোন নির্জনে টেনে নিয়ে কমলাকে বুকের মধ্যে পিষে ফেলে। আজও নির্জন।

নিভৃত। তার থেকে বেশি। আজ কমলা নিজেই তার বুকের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। পিষে ফেলবার সেই উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতিটা এখন সত্য। প্রত্যক্ষ। প্রখর। সেই ইচ্ছেটা এখন রক্তে বিদ্যুৎ হয়ে পাক খাচ্ছে। চুম্বক হয়ে রমেশকে তার সমস্ত প্রতিরোধ প্রতিবাদ থেকে ছিঁড়ে এনে নিঃসহায় করে ফেলছে। একটা অতল বাসনা হয়ে থৈথৈ করছে রমেশের শরীর। সত্তা।

কমলার ঠোঁট এসে ঠেকল রমেশের ঠোঁটে। নরম মিষ্টি তপ্ত এক টুক্‌রো সুগন্ধ মাংসের স্বাদে লালায়িত হয়ে উঠল তার দেহের গ্রন্থিগুলি। আর্দ্র সিক্ত স্নাত হল রমেশ।

উষা না। মনে পড়ে না উষা কখন এমন করে ঠোঁট এনে এগিয়ে দিয়েছে রমেশের ঠোঁটে। উষা তাকে কখনও চুমু খেয়েছে মনে পড়ে না। এমন করে ত নয়ই। কোন রকম করেও না। রমেশই চুমু খায়। তাও কত আল্‌তো করে। মনের উত্তেজনা মিটিয়ে তাপ জুড়ানো দীর্ঘ চুমু কোনদিন খেতে পারে না। মাঝখানেই উষা ব্যস্ত হয়ে আলগা হয়ে যায়। 'এই দাঁত বসে যাবে। গালে দাঁতের দাগ দেখলে লোকে কী বলবে বলত ?'

কে কী বলবে, তাই ভেবে উষার লজ্জা। স্বামীর চুমু বউয়ের গালে কপালের সিঁদুরের মত আদরের হয় না কেন ভাবে রমেশ। বিরক্ত হয়। উষাকে তখন চুমু খেয়ে বলে, 'তুমি আমার গালে দাগ বসিয়ে দাও। সে চিহ্ন নিয়ে আমি ঘুরব। দেখো, একটু লজ্জা করবে না আমার। কেউ কিছু বললে, বলব বউয়ের দেওয়া আদর।'

'বেহায়া।'

লজ্জায় হেসে উষা বলে।

এগিয়ে চুমু খেতে আসে বটে তখন ; কিন্তু কী লজ্জা যে ওর। চুমু খেতে পারে না। অনেক চেষ্টায় লজ্জা ঠেলে এলোমেলো করে

অতিশয় অপটু একটা চুমু খায়। দায়সারা একটা কঠিন কাজ যেন করল এমন। এই রকম।

কমলা চুমোয় চুমোয় ভরে দিচ্ছে রমেশের গাল। ঠোঁট। রমেশও। কমলা আপত্তি করছে না উষার মত। বরং খুশি হয়ে নিজেকে আরও এগিয়ে দিচ্ছে। রমেশ সাধ মিটিয়ে চুমু খাচ্ছে। এক সময়ে কমলা রমেশের জিভটা টেনে নিল তার মুখের মধ্যে। জিভে জিভ ঠেকতেই রমেশের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে রক্ত যেন ঝড় হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ দাহে পুড়তে লাগল রমেশের পেশী মাংস।

কমলা এখন রমেশের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসল। আস্তে করে আলগা হয়ে গেল রমেশের বুক থেকে। রমেশের মনে হল তার মুখ থেকে ক্ষুধার গ্রাস কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে কমলা। সে কমলাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়াল। রমেশের সাদা চোখে রঙ ধরিয়েছে কমলা। তার হিম রক্তে আগুন জ্বালিয়েছে। কুটিলা স্বৈরিণী পিছু হটে কুলকুল করে হেসে উঠল। রমেশ ছুটে গেল তাকে ধরতে। কমলা ছুটে পালাল ঘরের আর এক প্রান্তে। সোফা সেটের পেছনে এসে দাঁড়াল। রমেশ সেখানে তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। কোন দিকে যেতে পারছে না কমলা। তখন কমলা হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা তুলে ধরল, 'নাও, চায়ে চুমুক দাও।'

রমেশ অভিমান করে কাপ সুদ্ধ হাতটা ঠেলে দিল। কমলা আর এক হাতে একখানা বিস্কুট তুলে নিল, 'নাও, তবে বিস্কুটটাতে কামড় দাও।'

এবার আর অভিমান করল না রমেশ। জেদ ধরল। হাত ঠেলে না দিয়ে হাতটা ধরতে গেল মুঠোয়। রমেশের আঙুলগুলি কমলার কবজিতে সাঁড়াশির মত চেপে বসবার আগেই কমলা হাত

সরিয়ে নিতে পারল। হাত সরিয়ে নিতে পেরে এমন ঝংকার দিয়ে হেসে উঠল যেন ডানা ঝাপটে একটা পায়রা কলরব করে উড়াল দিল। সত্যি উড়ল কমলা। আঁচল উড়িয়ে ছুটল। রমেশ হাত পেল না, আঁচলটা পেল কমলার। কিন্তু আঁচল ধরেও আটকাতে পারল না তাকে। একটা শূন্য খোলসের মত সাড়িটা তার হাতেই থেকে গেল। যেন গুটি ঘর কেটে উড়ে গেল একটা প্রজাপতি। শিকল কেটে একটা পাখি পালিয়ে গেল। বিমূঢ় হয়ে গেল রমেশ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কমলার কুলকুল চাপা হাসিটা এস্রাজের সব ক'টা তার একসঙ্গে বেজে ওঠার মত ঝংকার হয়ে বদ্ধ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে সুর ভাঁজছে। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রমেশ। বুকের মধ্যে ঢেঁকি কুটছে। দম যেন আটকে আসছে। খাবি খাওয়া মানুষের মত শ্বাস টেনে টেনে রমেশ দেখে একটা ডানা ভাঙা পাখির মত একটু উড়ে গিয়ে খাটের ওপরে লুটিয়ে পড়ল কমলা। রমেশ কী ছুটে গিয়ে কমলাকে ধরে ফেলবে এখন। নাকি ধরতে গেলেই আবার উড়াল দেবে কমলা। উড়ে পালাবে। কমলাকে তাড়া করবার জন্যে, তাকে মুঠোয় করে ধরবার জন্যে এক দুর্বোধ্য আকাঙ্ক্ষায় কমলার মত পাখি হতে চেয়ে নিজের আবরণ ছিঁড়ে, কমলার মতই বেরিয়ে এল রমেশ। আর তাই করে সদ্য খোলস মুক্ত সাপের মত হঠাৎ অবশ হয়ে গেল সে। পাখির মত উড়তে পারল না রমেশ, জন্তুর মত ছুটতে পারল না। দুরন্ত চেষ্টায় সে শুধু কাঁপতে থাকল। একটু পরে যেন সে নিজে নয় তার বুকের মধ্যেকার উত্তাল সমুদ্র-রক্ত একটা বিপুল ঢেউ হয়ে এক ধাক্কায় তাকে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল কমলার শরীরে।

বিপন্ন-সুখে রুদ্ধশ্বাস কমলা বলে উঠল, 'দোহাই তোমায়, আমাকে ধরো না। তুমি যা এখন হয়েছ! তুমি আমাকে এখন বুকের মধ্যে পেলে পিষে পিষে মেরে ফেলবে।'

'ফেলবই ত।'

রমেশ হাসছে না। আর্দ্র সিক্ত থস্‌থসে মাখনের মত প্রগাঢ় চেহারা তখন রমেশের।

রমেশকে পাগল করতে পেরেছে কমলা। তাকে রক্তে মাংসে উচ্ছৃঙ্খল করতে পেরেছে। কমলা সিদ্ধির সুখে হাসল। যেন আর নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এমন এক হতাশা শরীরে ছড়িয়ে দিল কমলা। শিথিল শরীর বিছিয়ে দিল বিছানায়। সে দৃশ্য রিরংসায় নীল নির্মম শিখা হয়ে জ্বলে উঠল রমেশের কপিশ-চোখে।

আর একবার কমলার বাহু লতা হয়ে জড়িয়ে ধরল রমেশের দেবদারু শরীর। কিছুক্ষণ আগেও যে কমলা তাকে আদর করছিল এ যেন সে নয়। কমলা না। আর একজন। অন্য মানুষ কিংবা কোন পরী। অপ্‌সরী।

কাল রাতে উষাকে সে এমনি করে পেয়েছিল; কিন্তু ঠিক এতখানি করেই কী! এমন সব-ডুবনো অনুভব দিয়ে! এখন বুঝল রমেশ, তুলনা করে জানলঃ উষা লজ্জায় সংকোচে অপটুতায় ভোগের অনেকখানি সুখই বরবাদ করে দিয়েছিল। আরও অনেকখানি বরবাদ করে দিয়েছে তার দৈন্য। এমন দুধ রঙ আলো নেই তার ঘরে। এমন দেওয়াল জোড়া আয়নাও না। এমন ফেনার মত নরম বিশাল শয্যাই বা কই তার! থাকলেই বা কী হত! এমন সমস্ত অঙ্গ দিয়ে আসঙ্গ দেবার বুদ্ধি, মন, আগ্রহ—এমন বাসনার বাষ্পে থক্‌থকে সাবান শরীর উষার মধ্যে ছিল কই। ছিল না। কমলার মধ্যে দুর্লভ সেই আর এক অভিজ্ঞতা আবিষ্কার করে মনে মনে কমলার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বিলিয়ে দিয়ে তার গোলাম হয়ে রমেশ কয়েক নিমেষে আর একজন হয়ে গেল। অন্য মানুষ।

গ

কমলা রমেশের সব সংশয় সংস্কার গুড়িয়ে দিয়েছে। কমলা আজ তাকে সব—সমস্ত দিয়ে প্রমাণ করেছে সে রমেশকে ভালবাসে। নিশ্চিত বিশ্বাসের সুখে রমেশ যেন আর একজন হয়ে গেছে। কলজের কুশনে কোথায় একটা পিন খচ্ খচ্ করছিল বটে কিন্তু রমেশ তাকে আমল দিতে চাইল না। যুক্তি দিয়ে বোঝাল, কমলা তাকে এতদিন যা বলেছে তার একবিন্দু মিথ্যে নয়। আজ কমলা তা প্রমাণ করেছে। এ প্রমাণ রমেশ অনেকদিন আগে থাকতেই পেত। তখন কমলার জন্যে তার লোভ হত, তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করত। কিন্তু চা-ফেরিঅলা রমেশ, নোংরা গরীব রমেশ সে ইচ্ছে পূরণ করতে সাহস করেনি। তার নিজের মনের ভীরুতার জন্যেই তার মনে হয়েছে কমলা অর্থ-লোভী। তার কাছে ভালবাসা বলে কিছু নেই। টাকা রোজগার করতে এ পথে নেমেছে, টাকা চায় সে। ভালবাসা বেচতে নেমেছে। ভালবাসা ফেরি করে বেড়াচ্ছে। ভালবাসা চাও, দাম দাও। যত দাম দেবে তত ভালবাসা পাবে। দামের ওজনে ভালবাসা। যেমন পাচ্ছে এখন রামবিলাস। কমলাকে গাড়ি কিনে দিয়েছে। নিউ আলিপুরের ওই রাজপ্রাসাদের মত বাড়ির সুন্দর এক ফ্ল্যাটে বাসা করে দিয়েছে। বিলাসের কোন দ্রব্যের ত্রুটি রাখেনি। যা যখন চাইছে পাচ্ছে কমলা। পঞ্চাশ টাকা দামের ভেলভেট ব্লাউজ দেড়শ' টাকা দামের শিফন সাড়ি নিজের চোখেই ত তাকে কিনতে দেখল রমেশ। যতখানি দিচ্ছে রামবিলাস ততখানি তাকে ভালবাসছে কমলা। টাকার মূল্যে ভালবাসা যেমন করে দিতে হয় তেমন করেই দিচ্ছে। কিন্তু আজ রমেশ জানল টাকা দিয়ে ভালবাসা কেনা যায় না। শরীর কেনা যায়। মানুষ যেমন করে পাঁঠা মুরগী

কেনে মাংসের জন্যে। রামবিলাস কমলার ভালবাসা পায়নি। কমলাকে টাকা দিয়েছে অনেকে, কেউ ভালবাসা পায়নি। টাকার বদলে যা দেওয়া যায় সেই শরীর দিয়েছে কমলা। দিচ্ছে। টাকার বদলে ভাড়া খাটছে কমলার শরীর। মন পড়ে রয়েছে একা। নির্বান্ধব। কেউ চাইলেই তাকে মন দেওয়া যায় না। মনের মানুষ না পেলে মন পড়ে না তার ওপরে। মন দেওয়া যায় না তাকে। তাই হাজার জনতার মধ্যেও মন থাকে নির্জন। নির্জন, নির্বাসিত।

রমেশ আত্মপ্রসাদের সুখে ভাবল, কমলার মনের মানুষ সে। সেই প্রথম-দেখার দিন থেকে কমলা তাকে মন দিয়ে বসে আছে। ইচ্ছা করলেই, হাত বাড়ালেই সেদিন সে কমলাকে পেতে পারত। সবার থেকে কেড়ে এনে নিজের করে পেতে পারত চিরদিনের জন্যে। কিন্তু তখন কিছু বুঝতে পারেনি। তার সেই অন্ধতার সুযোগ নিয়েছে উষা। সে তাকে কমলার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আজ উষাকে ছেড়ে এলে কেমন হয়। কেমন হয় তাকে এভাবে হরণ করবার জন্যে কঠিন শাস্তি দিলে। অনায়াসেই পারে রমেশ। কমলার মতন কঠিন খোলস-আঁটা কর্কশ বিদ্যুৎ বাতি নয় উষা। সে ভাঙা ঘরের নিরাবরণ নরম তেলের বাতি। একটি দুর্বল পলতের প্রান্তে অন্ধকারের-ভয়ে-থরথর ভীরু একটি শিখা। ইচ্ছা করলে রমেশ তাকে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে পারে। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রমেশের। সরু পলতের মুখে ভঙ্গুর একটি স্নিগ্ধ শিখার হলুদ নরম একটি ছায়ায়ই যেন কেঁপে উঠল রমেশের বুকে! অত দুর্বল অত নরম বলেই যেন সে সংকল্প অসম্ভব রমেশের কাছে। মাকড়সার সুতোর মত অলক্ষ্য বেড়িতে কী কঠিন করেই না উষা তাকে বেঁধে ফেলেছে। সে বাঁধন লোহার বেড়ির থেকে শক্ত হয়ে বসে গেছে তার বুকে। লাগছে। তবু, অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলতে পারা যায় বলেই বুঝি তাকে ছিঁড়তে পারছে না রমেশ। পারবেও না কখনো।

পলকা প্রদীপের আলো সামান্য নিঃশ্বাসে নিভে যাবে ভয়ে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও বুঝি ফেলতে পারছে না। বড় অসহায় উষা। একটা অসহায় লতার মতই দুর্বল। তার শক্ত শাল তরুর মত শরীরটাকে বেষ্টন করে সে বাঁচতে চায়। বাড়তে চায়। এমন নির্ভরতার ওপরে সে নির্মম হবে কী করে। অসহায় রমেশ অনন্যোপায়ের মত এক দুর্বোধ্য ক্রোধে ফুলতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। কেরোসিন শিখার মত ধূমায়িত হয়। জ্বলে। পোড়ে।

তৃতীয় পর্ব

এক

মাগো আমার এই তুচ্ছ জীবনের সামান্য সুখটুকু নিয়ে একি নিষ্ঠুর পরিহাস তোমার। তোমার এই ছোট্ট অসহায় দুঃখী মেয়েটাকে নিয়ে একি নির্মম খেলা খেলছ তুমি। আমি কোন্ পাপে এই কঠিন শাস্তি ভুগছি আজ। আমার কোন অপরাধের এই প্রাণান্ত যন্ত্রণা!

মাকে ত তুমিই আছাড় খাওয়ালে। তার চিকিৎসার জন্যে শয়তান ডাক্তারটাকে তুমিই পাঠালে। আমার শরীর খুঁড়ে খুঁড়ে সে তার চিকিৎসার মাশুল উশুল করল। আমার ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে আমার শরীর নিংড়ে মুদী আদায় করল তার দাম। মাকে বাঁচাতে নিজে বাঁচতে অবশেষে পথে এসে নামলাম। তুমি ত আমার জন্যে আর কোন উপায় রাখনি মা। তবে কেন লাঞ্ছিত এ জীবনে সামান্য একটু বাঞ্ছা পূর্ণ করে আবার তাকে কেড়ে নিয়ে কাঁদাচ্ছ আমাকে। মা মাগো, বল, জবাব দাও।

মায়ের কাছে নিত্য এই অভিযোগ করে উষা আর নিরুত্তর পাষাণ মূর্তির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। দেওয়ালে কপাল ঠোকে আর ফুলে ফুলে কাঁদে।

মেঘলা আকাশে ক্ষণকালের এক ফালি রৌদ্রের মত একটুকরো সুখ উষার দুঃখের জীবন নিমেষের জন্যে উজ্জ্বল করে কখন আবার তাকে অন্ধকার করে চলে গেছে। আজ অন্ধকারে কান্নাই তার একমাত্র সাথী। কান্নাই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

খ

কী সুন্দর ঘর। কত বড় পালঙ্ক। ড্রেসিং টেবিল। আলনা। আয়না। আলমারী। ফ্যান। রেডিয়ো। ট্রাঙ্ক ভর্তি কত সুন্দর সুন্দর সাড়ি। সায়া। ব্লাউজ। বডিজ। তাক ভর্তি কত শত জিনিস। সেণ্ট। স্নো। আলতা। পাউডার। স্বাচ্ছন্দ্যের সহস্র উপকরণ দিয়ে সাজান সংসার। রমেশ তাকে সুখী করবার জন্যে, তার সুখী হবার জন্যে কী না করেছে। যা যা বলেছিল কিছু করতে বাকি রাখেনি। ঝি আছে। বাচ্চা একটা চাকরও রেখে দিয়েছে। সে তাকে রানী করতে চেয়েছিল। উষা আজ রানী হয়েছে। রানী! কিন্তু বিধাতার কোন্ বিধানে জানে না উষা, ঐশ্বর্যের মধ্যে নির্বাসিত এক অভিশপ্ত রানী আজ সে।

অথচ অর্থ চায়নি উষা। ঐশ্বর্য চায়নি। সে চেয়েছিল একটি স্বামী। দুঃখই চেয়েছিল সে। দারিদ্র্য চেয়েছিল। আর চেয়েছিল নিরাভরণ একটি মানুষকে। তাকে আপন দেহের-মনের মধুর-উত্তাপে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে ভোগ করতে। কোথা থেকে অভিশাপের মত অর্থ এল। স্তরে স্তরে রঙিন জীবনের পলস্তরা দিয়ে ঢেকে ফেলল স্বামীকে। স্বামী আজ টাকা রোজগারেই মশগুল। টাকা পাপ। উষা তার নিজের জীবন দিয়ে জেনেছে প্রয়োজনের অধিক টাকা মানুষকে বাঘ করে। প্রয়োজনের অধিক টাকা যাদের আছে রাতের অন্ধকারে তারাই বাঘের মত হরিণ খুঁজে বেড়ায়। তার স্বামীও কি তাই হয়নি? এ উষার সন্দেহ নয়। এ তার সত্যি বোধ। স্বামী যখন বাড়ি ফেরে তখন সঙ্গে করে সে শুধু টাকাই আনে। আর সব ফতুর হয়ে আসে। উষার সেবা উষার সান্নিধ্য তাকে উষ্ণ করে না। উষাকে বুকে নিয়ে

যে-নিবিড় সুখ পেত একদিন, যে-সুখের প্রত্যাশা তার মুখে সব সময় রক্তের জোয়ার ডাকত, এখন তা রিক্ত। নীরক্ত। সেখানে এখন আর কোন আগ্রহই রক্তের অতিরিক্ত চাপে থমথম করে না। নারী হিসেবে উষার প্রয়োজন বুঝি শেষ হয়ে গেছে।

দুঃখের ভাবনায় উষার মুখ অন্ধকার থাকে; কিন্তু এসব মনে হবার সময় সে-অন্ধকার মুখে বুঝি সপ্তর্ষির আলো এসে পড়ে। চকচক করে মুখ। কানের লতি নাকের ডগা লালচে হয়। সত্যি ত কয়েকদিনের জন্যে হলেও আজ ত সত্যি সে অক্ষম অসমর্থ। একটা সুখ মলিন-মুখ উজ্জ্বল করে। তার পেটে সন্তান। সে মা হবে। মাতৃত্বের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ে উষা। স্বামীকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে। সে অপ্রয়োজনীয় হোক! তবু তার স্বামী সুখী হোক। তার দেবতা। যে তাকে পাপের থেকে তুলে এনে পুণ্যের সংসারে পবিত্র করেছে তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করবে না সে। হৃদয়ের প্রান্ত থেকে ক্ষুদ্র গৃহকোণে নির্বাসিত হয়েছে বলেও না।

উষা নিজেকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু শান্তি পায় না। ছোট্ট ফ্ল্যাটটার শূন্য ঘরে ঘরে পায়চারি করে বেড়ায়, আর তাঁকে সুখী করার জন্যে স্বামীর আনা সুন্দর জিনিসগুলি দেখে। দেখে আর গুমরে গুমরে কাঁদে। মনে পড়ে রমেশের সেই কথা—'তুমি আমার রাঁড়ও নও, মাগও নও। তুমি আমার বোন।' সত্যি তার কাছ থেকে সে বুঝি কেবল বোনের আদরই পেয়ে এসেছে। পাচ্ছে। অসহায় একটা মেয়ে মানুষের প্রতি অনুকম্পাই শুধু পেয়ে আসছে সে। স্ত্রীর সোহাগ পায়নি কখন। প্রেমিকার প্রেম কোনদিন ভাগ্যে জোটেনি তার। নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে আরো নীরব নিস্পৃহ হয়ে যায় উষা। নিভৃতে নির্জন ঘরে একাকী শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কাঁদে।

দুই

কেন কেন কেন···কার জন্যে সে এমন তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে নিয়তি কেন তার পেছনে নির্মম জল্লাদের মত ঘুরছে আজ। কাকে সুখী করবার জন্যে সে আজ এমন বেঘোরে মরতে বসেছে।···বিন্নার ঝোপের মতন রুক্ষ এলোমেলো চুলের মধ্যে আঙুল গলিয়ে মাথাটাকে মুঠোয় করে বসে থাকে রমেশ। রমেশ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে আলোটার দিকে।

নিচু ছাদ। ছোট ঘর। 'বারের' পেছনে এক ফালি বারান্দা কেটে তৈরি একটা অন্ধকার আশ্রয়। এক সময়ে হাঁড়িতে চড়বার অপেক্ষায় মুরগী থাকত। এখন পলাতক আসামীরা শ্যেন চক্ষু এড়িয়ে দু'দণ্ডের জন্যে বসে। বসে ক্লান্ত হাড় একটু জুড়িয়ে নেয়। দু'গ্লাস মদ গলায় ঢেলে নেতান-স্নায়ুকে চাঙ্গা করে একটু। আবার চুপ-পায়ে শেয়ালের মত পালিয়ে যায়।

অন্ধকার ছোট্ট খুপরিটা যেন নীল ধোঁয়ার গুদোম। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় রুদ্ধশ্বাস মলিন বাল্‌বটা মূর্তির কাচ-চোখের মতন জ্বলছে। তেমনি নিস্পৃহ। নিরাসক্ত। যেন ঊষার চোখ।

··· ··· ··· ···

তুমি ফ্যান খোল না?'

'ঘরে এত হাওয়া আবার ফ্যানের দরকার কী!'

তবে কিনেছি কেন?

কপাল কুঁচকে যায় রমেশের।

'তুমি রেডিয়ো শোন না ?'

'তুমি কাছে না থাকলে একা আমার গান শুনতে ভাল লাগে না।'

রমেশের ভুরু ধনুক হয়। রেডিয়ো শোনবার জন্যে পুরুষ মানুষ ঘরে বসে থাকবে নাকি। কোন্ বাড়িতে থাকে ? থাকে যাদের অঢেল পয়সা আছে। বুঝি তারাও থাকে না। নিত্য সর্বক্ষণ একটা মুখ, সে যেমন চাঁদমুখই হোক, কার ভাল লাগে। আর প্রাণ রাখতে যাদের প্রাণান্ত চাঁদমুখের টান যতই থাকুক বাড়িতে থাকা তাদের ভাগ্যে ঘটে না।

'তুমি ভাল সাড়ি পর না কেন ? আমি পরি না বলে নাকি ?'

ব্যঙ্গ করে রমেশ।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে উষা, 'তুমি পরবে কেন ? তুমি দেখবে। কিন্তু সে সময় তোমার কই ?'

নেই-ই ত। থাকলেই বা ওর সাড়ি-পরা শরীরটা দেখতে ঘরে বসে থাকত নাকি রমেশ।

'তুমি ওই জন্যেই বুঝি গয়নাও পর না ?'

তুমিই ত আমার গয়না।'

বলার সময়, বলতে বলতে উষার মুখখানা কেমন আলো হয়ে ওঠে।

বাসি রক্তের মত কালো জ্বলন্ত জলের মধ্যে সে-হাসি চলকায়, থর্‌থর্ করে। রমেশ মুখ বিকৃত করে। মুখ ফেরায়। ভাল লাগে না। নিজেকে সাজিয়ে সুন্দর করে স্বামীর কাছে আসার থেকে বাড়া ভাত নৈবেদ্যের মত সাজিয়ে পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়ে পরিতুষ্ট করে খাওয়ানোতেই যেন সব সুখ তার। খেতে দিয়ে পাখা নিয়ে সামনে বসবে। কোন্ রান্না ভাল হল, কোনটা পছন্দ হল না, খুঁটে খুঁটে জানবে। নিত্য নতুন রাঁধবে। সে যেন গুরুদেব।

'গুরুই ত তুমি আমার। আমার দেবতা। পতিতপাবন ঈশ্বর।'

উষার স্মিত মুখের স্নিগ্ধ স্বর রিম্‌রিম্‌ করে বেজে ওঠে রমেশের কানে, তার উত্তাল রক্তে।

রমেশ শক্ত করে গ্লাসটা ধরে। নিশ্চল হয়ে বসে থাকে।

আগে ভাল লাগত। স্ত্রীর ওই সেবার মধ্যেই সত্যিকারের সুখ মনে হত। আজ জেনেছে রমেশ, কমলা তাকে অভিজ্ঞ করেছে, শিখিয়েছে, ওগুলি ঝি চাকরের কাজ। স্ত্রীর নয়। স্ত্রীর কর্তব্য কিছু শিখল না উষা। কিছু জানল না।

'তুমি ঝিয়ের মেয়ে। এর থেকে বেশি কি হবে!'

'এর থেকে বেশি আমি হতে চাই নাকি। জন্ম জন্ম যেন তোমার ঝি, সেবাদাসী হয়ে থাকি।'

'ঘোড়াড্ডিম!'

রমেশ ক্ষেপার মত গ্লাসটাকে টেবিলে ঠোকে।

উষা থামে না।

'তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ নরক থেকে···'

চীৎকার করে ওঠে রমেশ, 'ঝি চাকরের মত সেবা করে তুমি সে ঋণ শুধছ।'

শিউরে ওঠে উষা। রমেশের ক্ষ্যাপামি দেখে ভয় পায়। চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ে রমেশের বুকে। গলা জড়িয়ে ধরে।

'আমার এই দেহ তোমার। আমার এই মন তোমার। আমার এই আত্মা তোমার।'

রমেশের চিবুকের নিচে মাথা রেখে বুকে বুক চেপে কোন্‌ সুখের গহনে ডুবে যায়। উষার ওপরে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ রমেশ তখন নিজেকে উষার থেকে ভিন্ন করে নিতে পারে না।

তখন রমেশেরও যেন কী হয় মনের মধ্যে। ঝড়ের আকাশ থেকে ছিটকে-পড়া একটা পাখির মত উষা তার বুকে ছট্‌ফট্‌

করে। রমেশ তার পিঠে হাত বুলোয়। একটা নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস রমেশের আঙুল বেয়ে বেয়ে উষার সর্বাঙ্গে আত্মায় ছড়ায়। একটা ঝড়-ভয় ভীরু পাখিই যেন পালছে রমেশ। স্নেহে ভরে ওঠে রমেশের মন। মমতায় বুক ভরে। একটি পাখির বুকের কবোষ্ণ উত্তাপে তার বুকও উষ্ণ হয়। তৃপ্ত হয়। দুটি হৃদয় একটি বৃত্তে মিলিত হয়ে একাত্ম হয়ে যায়। দুটি সত্তা একটি শিখা হয়ে জ্বলে।

বুকটা তার ছিঁড়ে যায়। ভেঙে যায়। ছেড়ে যেতে পারবে না সে উষাকে। পারবে না। না।

গ্লাসের ওপরে উবুড় হয়ে গ্লাসে গাল চেপে ধরে। 'না। না। আর টাকা চাইনে আমি। টাকা না। তোমাকে চাই উষা। তোমাকে ··'

···গ্লাস থেকে গন্ধ এসে রক্তে ছড়ায়। রক্ত যেন গ্লাসের লাল শুষে নিয়ে গাঢ় হতে চায়। লাল—ভয়ংকর লাল হতে চায়। রমেশ এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা নিঃশেষ করে।

বয় আবার পূর্ণ করে দিয়ে যায় গ্লাস। ফেনায়িত লাল রসের পাত্রে তখন কমলার রং চলকায়। কমলার মুখ ভাসে। কমলার মুখ হাসে। মাছরাঙা পাখির ডানার মতন একটা রঙিন হাতছানি তার চোখের পাতায় কাঁপে। ডাকে—চল, কোনো সমুদ্রের ধারে অথবা কোনো পাহাড়ের গায়ে ডেরা বাঁধি আমরা : চখা-চখির মত মুখে মুখ বুকে বুক রেখে সুখী হই। রমেশের গাঢ় রক্তে একটা শারীর-স্মৃতি নেশা হয়ে থৈ-থৈ করে। একটা উষ্ণ অবয়বের কুশন-আসনে বসে আছে যেন এমনি অনুভূতিতে অবশ হতে থাকে শরীর। কমলার দুটো হাত ফুলের মালার মত বেষ্টন করে তার কাঁধ বুক। ক্রমশ কঠিন হয়ে এক সময়ে সে-যেন স্বর্ণ বলয় হয়ে যায়। পিষে ফেলে কমলা তাকে তার উরসে জঠরে জঘনে। এক সময়ে একটি শরীর আর একটি শরীরকে অনুভব করতে করতে

সর্বাঙ্গে মিশে যায়। অনেক যন্ত্রের ঐকতান বাজনার মত দুটো দেহ এক ছন্দে মেতে ওঠে। একটি সুরে দুটো শরীর ঝংকৃত হয়। জ্বরো জ্বরো মাংসের উষ্ণ গভীর থেকে ফেনায়িত সুখ রিরংসার আগুনে জ্বলে জ্বলে আর এক রসায়ন হয়। সে রসের স্বাদে স্নায়ুতে স্নায়ুতে দুঃসাহস খল্‌খল্‌ করে। বেপরোয়া জীবন দস্যু হয়। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে ভয় থাকে না। ওই চোখ ওই শরীর সামনে করে রমেশ সব পারে। সব—সমস্ত।

কিন্তু কই পারছে কই। কমলার মুখটাকে ধরে রাখতে পারছে না ত। একটা পাথরের চাঁইয়ের ছায়ার মত অন্ধকার গ্রাস করে ফেলল যে কমলার মুখ। রমেশের চোখ গোল হতে থাকে। গোল, বিস্ফারিত।

রমেশ কী এক ভয়ংকর ভয়ে কেঁপে ওঠে। গায়ের রোম খাড়া হয়। দুহাতে মদের গ্লাসটাকে শক্ত, আরো শক্ত করে ধরে। চোখ বোজে রমেশ।

না না আর থামতে পারে না রমেশ। আর ফিরতে পারে না। সে যেন একটা দুরন্ত দুর্নিবার নদী। অন্তিম লক্ষ্যের দিকে অনিবার্য বেগে ছুটে চলেছে। তার এক পার ঊষা আর এক পার কমলা। এক পার থেকে ব্যাকুল আকুতি কাঁদছে—ফিরে এস, ওগো ফের। আর এক পার থেকে কুলকুল হাসি উঠছে ভোগ আর অর্থের হাতছানি ডাকছে—এস, ছুটে এস। আগে আরো আগে। একজনের হৃদয়ের বৃত্ত থেকে আর একজনের দেহের বলয়ে আছাড় খেতে খেতে ছুটে চলেছে রমেশ। কিন্তু কারো হাতে ধরা দিতে পারবে না আর রমেশ। কেউ আর তার পায়ে বেড়ি দিয়ে আটকাতে পারবে না। উপায় নেই। কারো না। কোথায় অন্তিম রমেশের—ঐশ্বর্য ভোগ তৃপ্তির আকাশ ছোঁয়া সমুদ্রে ভেবে ছিল প্রথম। এখন বিস্ফারিত চোখ করে শিউরে ওঠে রমেশ।

ধোঁয়া মেশানো আগুনের মত তরল সকল জ্বালার থেকে জ্বলন্ত জলের গ্লাসটায় অন্ধকার ঘনায়। উজ্জ্বল থেকে গাঢ়তর কোন সুড়ঙ্গ-ছায়া থকথক করে। কালো, আরো কালো হয়। একটা বিশাল ভুঁড়ির ছায়া যেন ছেয়ে ফেলে সব—সমস্ত।

ওই নিকষ কালো গহন গহ্বরে তার শেষ। রুদ্ধশ্বাস মরণ। ভয়ে চীৎকার করে ওঠে রমেশ—উষা উষা উষা।

একটা গলা টিপে-ধরা পশুর যন্ত্রণা ফোটে ঠোঁট চিরে। একটা হাত শূন্যে কিছুক্ষণ কি খোঁজে তারপর এলিয়ে পড়ে টেবিলে চেয়ারের ওপরে ঘাড় কাত হয়ে পড়ে রমেশের।

তিন

কাঁদে কমলাও। উষার মত তারও বুকে আজ অসহ্য যন্ত্রণা।

রামবিলাস ডুব দিয়েছে। ঘাটি ছেড়ে তার সাঙাতরাও সরে পড়েছে কে কোথায়। কিন্তু রমেশদা, তার কি হল? সে আসে না কেন?

একটা অজানা আশঙ্কা ধুকপুক করে কমলার বুকে। অদৃশ্য একটা ভয় দশ আঙুলে যেন গলা টিপে ধরে তার। দম বন্ধ হয়ে আসে। একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছুটোছুটি করে কমলা। ঘরময় ঘুরে বেড়ায়।

বার বার ক্যালেণ্ডার দেখে। লক্ষ বার কর গোনে। মনে মনে বুঝি দিনরাত কেবল হিসাব করে। হাজার বার দরজা খোলে আর বন্ধ করে। ঝি বিলাসীকে ডেকে ডেকে কেবলই জিজ্ঞেস করে, 'রমেশদা এসেছিল নাকি রে? কড়া নেড়েছিল? তুই খুলে দিসনি? কারও সাড়া না পেয়ে চলে গেছে?'

বিলাসীর দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে। দশ আঙুলের দীঘল ধারাল দশটা নখ ব্লাউজ কেটে মাংস ছেঁড়ে। তবু ছাড়ে না বিলাসীকে।

'বল কি করছিলি?'

রাগ হয় বিলাসীর। বিরক্ত হয় সে।

'বা-রে কখন কড়া নাড়ল রমেশবাবু? তুমি ত সারাক্ষণ এ-ঘরে থাক। কড়া নাড়লে তুমি জানতে না? তুমি নিজেই ত লক্ষ বার দরজা খুলছ। বন্ধ করছ।'

তখন কেঁদে ফেলে কমলা।

'জানিস রমেশদা আর আসবে না। রমেশদা পালিয়েছে। পাছে আমি টাকা চাই। পাছে আমাকে টাকা দিতে হয়। কি নিমকহারাম লোকটা দেখলি।'

'সত্যি দিদিমণি, তুমি যাকে এমন করে দেহ দিয়ে মন দিয়ে ভালবাসলে, যাকে এত টাকা রোজগারের সুযোগ করে দিলে সে কিনা তোমার বুকে পাড়া দিয়ে আর একজনের গলা ধরে ঝুলছে।'

'কী বললি বিলাসী?'

ক্ষেপে উঠে তখন আরও কঠিন করে বিলাসীকে ধরে কমলা।

বিলাসী সেই যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে বলে, 'না হলে আসে না কেন? আজ দশদিন ধরে আসছে না কেন? সে ত বেশ জানে একদিন তাকে না দেখলে তুমি পাগলের মত হয়ে যাও।'

কমলার চোখ গোল হয়। গোল চোখে শুষ্ক কর্কশ কালো তারা ক্ষ্যাপা ভীমরুলের মত পাক খেতে থাকে। পাগলের মত গলায় বলে, 'তুই বলতে চাস রমেশদা অন্য কোন মেয়েমানুষ পেয়ে আমাকে ভুলে গেছে?'

'তা ছাড়া কি!'

বিলাসী যেন এতক্ষণের জ্বালার শোধ নেয়। 'এ লাইনের এই ত দস্তুর। সলিল দত্ত করেছিল না? সলিল দত্ত মেটিয়াবুরুজের সন্ধ্যাকে নিয়ে থাকত। সন্ধ্যা তার চোখের মণি ছিল। একদিন ঝড়ের সন্ধ্যায় তোমাকে পেয়ে সে সন্ধ্যাকে ভুলে যেতে তার এক মুহূর্ত লাগল না। তোমাকে নিয়ে বম্বে পালাল। সন্ধ্যা কাটা পাঁঠার মত দাপিয়েছে। দিন রাত শাপমন্যি করেছে। তেমনি ফলও ফলল। বেঘোরে মারা গেল সলিল। রমেশও মরবে।'

জুহুর সমুদ্র সৈকতের রক্তাক্ত ছবিটা আবার করে ভেসে ওঠে কমলার চোখে। আতঙ্কে থরথরিয়ে ওঠে কমলা। কিন্তু সে

আতঙ্ককে ছাপিয়ে আর একটা যন্ত্রণা যেন হঠাৎ এসে দু'হাতে তার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। দম আটকে আসে কমলার।

'কি বললি!'

চিৎকার করে উঠে থেমে যায় কমলা। তাকিয়ে থাকে। একথা কী তার মনে জেগেছিল? চিড়িক মেরেছিল কোনদিন? কোন সম্ভাবনাকে সন্দেহ করেছিল? আমল দেয়নি?

না না না। হতে পারে না। মিথ্যে কথা। পাগলের মত বলে 'তুই জানিস বিলাসী, রমেশদা সলিল দত্ত নয়। তাকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। অনেকদিন থেকে ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে অনেকদিন থেকে। সেই প্রথম দিনের থেকে।'

'তবে সে কোথায় গেল?'

'বিলাসী রে!'

ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে কমলা, 'ওই কাল সাপে বুঝি ওকে ছোবল্‌ মেরেছে।

'রামবিলাসের চাকরির একদিকে যমদূত আর একদিকে কালদূত। একদিকে পুলিশ আর একদিকে রামবিলাস নিজে। রামবিলাস যদি জানে পুলিশ তার দলের কারো চলাফেরার ওপরে নজর দিচ্ছে, তক্ষুনি সে সতর্ক হয়। তারপর কোনদিন যদি তাকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ, জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয় আর রক্ষা থাকে না তার। রামবিলাস এ দুনিয়া থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে তার দুর্গে ঢোকার সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দেবে।

'আমার ভয় হচ্ছে তেমনই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে ভয়ে এখন রমেশদা গা ঢাকা দিয়েছে। গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। নয়ত রামবিলাসও কেন আসছে না আজ ক'দিন?

'ক'দিন ধরে আসছে না রে? তিন চার দিন হবে, না? আমি

ঘুরে ঘুরে দেখেছি কলকাতার সবগুলি ঘাটি খাঁ খাঁ করছে। খাঁচা ছেড়ে সব পাখি জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে।

'দিক। কিন্তু রমেশদাকে পেতে হবে। আমি তাকে মরতে দেব না।'

দাঁতে দাঁত ঘষে কমলা।

খ

রাস্তার ওপারে পানের দোকানে বসে আছে, বসে থাকে; কে ওই লোকটা? লম্বা। লোহার রড যেন। তেমনি শক্ত। কঠিন। দস্যু-মতন। চোখে নীল চশমা। গালে গালপাট্টা দাড়ি। চেনা যায় না। কিন্তু চলার ধরন দেখে বারে বারে কার কথা মনে পড়ে? কে ও, কে!

দু'দিন থেকে দেখছে কমলা আর চিন্তা করছে।

লোকটার যেন তার জানলার দিকেই চোখ। একটা ছমছমে ভয়ের সন্দেহে কাঁপছে কমলা। অবশেষে দুঃসাহসে ভর করে একটা হাতছানি দিয়ে বসল কমলা। ইশারায় সাড়া দিয়েছে লোকটা। আসছে। কমলার বুকটা চলতে চলতে হঠাৎ স্ক্রু আলগা বেপরোয়া মেশিন হয়ে উঠল। দু' হাতে বুক চেপে দেখতে লাগল লোকটাকে। নিঃসন্দেহ হল। আসছে। সরে এল জানলা থেকে। ব্লাউজটা টান মেরে খুলে ফেলল। বডিজটা রইল শুধু গায়ে। সায়াটা ছেড়ে ফেলল। শুধু জাফরানি রঙের সিফন সাড়িটা সাপের খোলসের মত জড়িয়ে রইল কমলার গা।

লোকটি ঘরে ঢুকে চশমা খুলল। কমলার দিকে তাকিয়ে হাসল তারপর।

কমলা ভীষণ শিউরে উঠল এবার। সে-ই। সে। আবদুল।

…লোকটিকে সে প্রথম দেখেছিল দিল্লিতে। সেদিন চশমা, এ নীল চশমা ছিল কিনা মুহূর্ত চিন্তা করল কমলা। উহুঁ, ছিল না। কিন্তু এই রকমই দৃষ্টি ছিল। লোকটা তাকে দেখে হায়েনার মত শব্দ করে হেসে উঠেছিল। শব্দটা কয়েক মুহূর্ত পরে থেমে গিয়েছিল; কিন্তু হাসির নিঃশব্দ ঢেউটা তখনও চোখের তারায় তারায় কাঁপছিল। হয়ত গালের ঠোঁটের কোণে কোণে পাক খাচ্ছিল; কিন্তু সেদিনও ওর এমনি দাড়ি ছিল আর যত্ন করে পাকানো লম্বা গোঁফ ছিল, তাই চোখে পড়েনি কমলার। সেই হাসি-কাঁপা চোখে সে এগিয়ে এসেছিল, খুব কাছে এসেছিল। এসে কমলার মুখের ওপরে চোখের মধ্যে চোখ রেখেছিল। কমলা তখন দেখেছিল। কোন ক্রূর হিংসুক জন্তুর মত এই চোখ সে দেখেছিল। ভয়ের সামনে কমলা কোনদিন চোখ বুজতে পারে না, তাই দেখেছিল। লোকটাকে তার ভয় করেছিল—ওই চোখ ওই হাসি; লোকটা তখনও হাসছিল। কমলার বুক দুপ্ দুপ্ করেছিল। তার মনে হয়েছিল, সেই হাসির ভিতর থেকে একটা শয়তানের আত্মা যেন উঁকি মারছিল চোখের তারায়, একটা নোংরা ইচ্ছে যেন পচা পনিরের মত থক্‌থক্ করছিল সেখানে। কেন ওকে নিয়ে এসেছে সলিল দত্ত? মনে মনে ক্ষেপে উঠেছিল কমলা।

'মাইরি সলিল, তোকে পেন্নাম করতে ইচ্ছে করে।' পান দোক্তায় খয়েরি দাঁত বার করে বলেছিল আবদুল, 'শালা, কী চিজ এনেছিস মাইরি! রাখতে পারবি? সর্দারের চোখ পড়লে শালা পস্তাবি। তোর ভোগে কাঁটা দিয়ে এ মাল সে কেড়েই নেবে দেখিস।'

সলিল দত্ত দাঁতে দাঁত ঘষেছিল।

'জান কবুল শালা।'

'সর্দারকে দিবি নে?'

চোখ ছোট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছিল আবদুল।

'না।'

সলিল রুখে উঠেছিল।

'রুখতে পারবি?'

চোখের কোণে আবদুলের চাহনিটা ইস্পাতের চাকুর মত ঝিকিয়ে উঠেছিল।

'আলবাৎ।'

সলিল হয়ত গ্রাহ্য করেনি সে চাহনি, কিংবা ওর অর্থ বোঝে নি।

'না সোনার চাঁদ, একা পারবে না। পারতে চাও ত আমাকেও ভাগ দিতে হবে।' বলে সলিলের কাঁধে হাত রেখে আবদুল হেসেছিল।

কমলার সামনে! কমলা লোকটার ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সলিলের মত সেও যেন রুখে উঠেছিল মনে মনে। তখনই একটু আগেকার ভয় ঘৃণা হয়ে ফেনাতে শুরু করেছিল বুকের মধ্যে। বিষ লাগছিল লোকটাকে। লোকটাকে সেই থেকে সে বিষ নজরে দেখে আসছে। ঘৃণা করে আসছে। কিন্তু কমলা কোনদিন তাকে তা বুঝতে দেয়নি। জীবনে যার ভর করবার মত স্থায়ী কোন অবলম্বন নেই, যার জীবন স্রোতের জলে নিরুদ্দেশ ভেসে চলা কুটোর মত তার হাতের কাছে যে যখন আসে সেই তার আশ্রয়। সুতরাং মনের ঘৃণা মুখে প্রকাশ করে না কমলা, সেদিনও করেনি।

হয় ত আবদুলেরই উস্‌কোনিতে রামবিলাস এমন তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়েছিল তার দিকে। কিন্তু সলিল বেচারা কমলাকে

ভালবেসে ফেলেছিল বলেই বুঝি সব বুঝেও ঘাড় কাত করে ষাঁড়ের মত ফুঁসে উঠেছিল। আহ্, কিন্তু সলিল যদি জানত কমলা তাকে ভালবাসে না। তার মতন মেয়েরা বড় সহজে কাউকে ভালবাসে না, সলিল হয়ত বেঁচে যেত, সে বলত না—

'কমলিকে কেড়ে নিলে আমি দল ছেড়ে দেব।' বলে উঠেছিল সলিল, সে দলের গায়ে তার বিষদাঁত বসিয়ে দেবে বুঝি তেমনও ইঙ্গিত ছিল সে কথায়।

'বেশ তাতে যদি তুমি আখেরে শান্তি পাও, তাই করো!'

অতএব সলিল দত্ত কমলাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল বম্বেতে। কিন্তু বুঝি একটা মাসও পালিয়ে থাকতে পারেনি। ওদের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ পালিয়ে থাকতে পারে না। সলিলও পারল না। জুহুর সমুদ্র-পাড়ের বালিতে মুখ থুবড়ে নিষ্প্রাণ পড়ে থাকতে হল তাকে।

এ যে আবদুলেরই কাজ মাদ্রাজ থাকতে কমলাকে সে কথা গর্ব করে শোনাতে এসেছিল সে।

'লোকটা আমার কথা মানল না, গোস্তাকি করল। আরে, আমরা হলাম গিয়ে সাঙাত কী বলে? ভাই বেরাদার।' চোখের তারায় তামাশার একচিলতে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বলেছিল, 'যে যা পাব ভাগযোগ করে খাব, তা না তিনি একাই খাবেন সব। সয় না, মাইরি বলছি কম্‌লি, সয় না। সলিলটার ভাগ্যেও সইল না। সর্দারের হুকুমে কাজটা অবশ্য ··' হোহো করে হেসে উঠেছিল আবদুল, কথাটাকে আর শেষ করেনি।

'কিন্তু এখন কি মতলব? সর্দারের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে এসেছ নাকি?' চোখের কোণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে জিজ্ঞেস করেছিল কমলা।

'তোবা তোবা!' হেসে সোফায় কাত হয়ে পড়েছিল আবদুল,

তক্ষুনি আবার সোজা উঠে বসে বলেছিল, 'তবে কী জান্ কমলি গাইয়ে-বাছুরে দোস্তি থাকলে মালিককে কলা দেখাতে কিছু না।'

'কিন্তু সম্প্রতি আমি কেমন রানীর হালে আছি দেখছ ত!' চোখে গালে ঠোঁটে হাসির গুঁড়ো ছড়িয়ে বলেছিল কমলা।

'আমিও ত সেই রানীজীরই বান্দা হতে এসেছি।'

হঠাৎ তখনই হাত ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল আবদুলের, অথবা কী মনে মনে সে মুহূর্ত গুনছিল ? উঠে দাঁড়াল, বলল,— 'আভি চলি।'

কমলারও হঠাৎ তখনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল 'রামবিলাস ওর ওপরে নজর রাখছে না ত, অথবা যে কারণেই হোক, হয়ত এখনই রামবিলাসের এখানে এসে পড়বার কথা। এই সুযোগ, বুঝেছিল কমলা।

'এখনই যাচ্ছ কেন, বস না। আরও একটু গল্প করি।' চোখে চোখে কামনার চকমকি ঠুকে বলেছিল সে। তবু আবদুল বসেনি। দরজার পাল্লায় হাত রেখে ঘাড় ফিরিয়ে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলেছিল,—'আবার আসব।' হেসে বলেছিল, তখন হয়ত একটু নয়, অনেকক্ষণ বসব।'

অথচ আবদুল আর আসেনি। তারপর আর কোনদিন দেখেনি সে আবদুলকে।

কে লোকটা, কোথায় গেল, আর কেন আসে না, অনেক সময় জুড়ে অনেকদিন সে প্রশ্ন কমলার মাথায় পাক খেয়েছে।

শেষে একদিন রামবিলাসকে জিজ্ঞেস করে বসেছিল কমলা।

রামবিলাসের ভ্রূ কুঁচকে গেছে। ধারাল হয়ে উঠেছে চোখ। তক্ষুনি সে জবাব দিতে পারেনি দু'মুহূর্ত সময় নিয়ে বলেছিল, 'আবদুল আমার কী কাজ করে জান?'

'না।'

মাথা নেড়েছিল কমলা তার জানার কথা নয়। তবু তক্ষুনি রামবিলাসের মুখের দিকে চেয়ে যেন সে জেনেও ফেলেছিল। যেন মনের মধ্যে কে তক্ষুনি বলে দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি কমলা। অতীত নিয়ে কমলা কখনো ভাবে না। অতীত তার ভবিষ্যতের সিঁড়ি। যে সিঁড়ি সে পার হয়ে আসে সে সিঁড়ির দিকে আর সে ফিরে তাকায় না।

'আবদুল এখন নেপালে,' যেমন করে জজ রায় দেন, বলেছিল রামবিলাস, 'নেপাল হয়ে আসাম যাবে। হয়ত আরাকানটাও ঘুরে আসতে পারে।'

শেষের অংশটা স্বগতোক্তির মত করে বলেছিল রামবিলাস।

আবদুলকে তুমি সরিয়ে দিয়েছ, এত দূরে যে, সে আর আমার দিকে হাত বাড়াতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি তাকে চাইতাম, তুমি ঠেকাতে পারতে কি! কমলা মনে মনে বলেছিল ও নিঃশব্দে হেসেছিল।

কিন্তু রামবিলাস হেসেছিল শব্দ করে। ভরা কুঁজো থেকে জল গড়ালে যেমন শব্দ হয়। হেসে মুহূর্তকাল থেমে, বলেছিল, 'আমাদের দলে বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই।'

একি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ তুমি? কমলা রামবিলাসের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল, তার চোখের পাতা পড়েনি অনেকক্ষণ। সেই অপলক চাহনিই কি উত্তেজিত করেছিল রামবিলাসকে। সে বলেছিল, 'তা বলে ওকে চট করে সরাতে পারিনি। ও-ই যে আমার সেই কাঁটা তোলার হাতিয়ার।' আর একবার হেসে উঠেছিল রামবিলাস।

মাদ্রাজের ফ্ল্যাটে বসে রামবিলাস সেদিন যে নির্মম হাসি হেসেছিল কলকাতার এই ফ্ল্যাটের দেওয়ালে দেওয়ালে আবার করে

যেন সেই হাসিটাই ভয়ানক শব্দ করে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল। যেন কাচের তৈরি সমস্ত দরজা জানলা এক সঙ্গে সহসা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। শিউরে উঠল কমলা। কমলার বুকের মধ্যে ছুপছুপ করে উঠল। তার পায়ের তলাকার মেঝেও যেন কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।...

ধূর্ত চোখে হাসতে হাসতে নিঃশব্দে ক' মুহূর্ত দেখে লোকটি প্রশ্ন করল, 'তাহলে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ কমলি?'

ছু' মুহূর্ত। মাত্র ছু' মুহূর্তে অতীতের সেই ভয়ংকর দিনক'টির স্মৃতি পরিক্রমা করে এসেছে কমলা। আর তাই করতে করতে, করে সে ক্লান্ত ভীত ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আবছুলের কথায় চমকে উঠল। চোখ তুলে তাকাল। আবার দেখল। হ্যাঁ, সেই চোখ, সেই হাসি!

কমলার রক্তবহা নলি বেয়ে সারা শরীরে যেন সাপ চলছে, এমনি হিম বোধ করতে লাগল সে। এমনি বিষ-ঠাণ্ডা।

কিন্তু এখন হতাশ হবার সময় নয়। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল কমলা। ভাঙা কাচের মত ফেটে ভেঙে যাওয়া সাহসকে একসঙ্গে করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। চোখের তারায় আলেয়ার আলো জ্বেলে বলল, 'বারে, চিনব না!'

সাপের মত হিস্‌ হিস্‌ শব্দ করে হেসে উঠল কমলা।

'বস। তারপর?'

আবছুলকে একটি সোফায় বসিয়ে দিয়ে কমলাও বসল তার পাশে।

'তুমি কলকাতায় কেন?'

'সর্দারের হুকুম।'

'সর্দার কোথায় ?'

'কেন ? তুমি জান না ?'

'জানলে কি আর জিজ্ঞেস করি ?'

আবদুলের উরুর ওপরে কনুই রেখে তার চোখে চোখ পাতল কমলা।

'আমি মেয়েমানুষ তোমরা না বললে কোথায় কী ঘটছে জানব কি করে ?'

'তাও বটে। তোমাকে খবর দেবার অবসরও বুঝি পায়নি সর্দার। অথবা বুঝি জানাতে চায়নি। পুলিশ রমেশকে ধরেছিল! পুলিশকে সে কি বলেছে কে জানে, পুলিশ আমাদের কলকাতার তিনটে ঘাটিতে হানা দিয়েছিল। অবশ্য কিছু পায়নি। আমাদের সব লোক ঘাটি ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে। রমেশের খোঁজে ডালকুত্তার মত সমস্ত কলকাতা শুঁকে ফিরছে সকলে। রমেশকে পাচ্ছে না।'

'তুমি এখানে কি করছিলে ?'

আবদুল হাসল।

'সর্দার বলল, সে নাকি তোমার পেয়ারের লোক, যেখানেই গা-ঢাকা দিক কখনো এক সময়ে তোমার এখানে আসবেই। নাকি আসতেই হবে।'

'তখন তাকে ধরবে তাই ওঁৎ পেতে আছ ?'

আবদুল এবার জোরে হেসে উঠল।

'সাপিনার চোখে সে হাসি দেখতে দেখতে আবদুলের দুই উরুর ওপরে নিজেকে এলিয়ে দিল কমলা। চোখের তীক্ষ্ণ কোণের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে শুধোল।

'তা পানের দোকানে কেন ? এখানে আসতে বারণ নাকি ?'

আবদুল দু' হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার জন্যে

আমার জ্বালাটা সর্দার জানে। মাদ্রাজে টের পেয়েছিল। তাই হুকুম ?......'

'আমি তার বিয়ে করা মাগ নাকি !'

'সর্দারের বোধ হয় তাই ধারণা।'

'তোমার কি ধারণা ?'

'ধারণা ছিল সে তোমাকে অনেক টাকায় কিনে রেখেছে। যখন শুনলাম রমেশ তোমার পেয়ারের লোক তখন বুঝলাম লোকটার ভুঁড়িতে শুধু টাকাই আছে গতরে আর কিছু নেই।'

কমলা আবদুলের গলা জড়িয়ে ধরে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল।

আবদুল জন্তুর মতন থাবা বাড়াল।

'ওকি যাচ্ছ কোথায় ?'

যেতে যেতে বিস্রস্ত বসনের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে একটা বিলোল চাহনি হানল কমলা, বলল, 'এখন তর সইছে না বুঝি আর, পানের দোকানে কিন্তু দিব্যি ছিলে ?'

গ্রীবায় একটা অবাধ্য ঘোড়ার ভঙ্গী করে বেরিয়ে এল কমলা।

বিলাসীর হাতে একশ' টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল, 'হুইস্কি এক বোতল, সোডা আর মাংস। ছুটে যাবি আর আসবি।'

বিলাসীর থুতনি ধরে একটা নাড়া দিল কমলা। বিলাসী হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না। তখন কমলার চোখে চোখ পড়েছিল। চমকে উঠেছিল সে। সর্বনাশের আগুন দেখলে যেমন করে চমকায় মানুষ।

... ...

খাটের ওপরে আড়াআড়ি শোওয়া আবদুল। তার চুলে

আঙুল ডুবিয়ে কমলা নিঃস্বর গলায় বলল, 'শোন, রমেশদাকে যদি পাও আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

'কিন্তু সর্দারের হুকুম। তাকে কোতল করা।'

'বেশ ত কোতল করো, কিন্তু তার আগে সর্দার থেকে যে টাকাগুলি সে কামাল সেগুলি চাও না?'

'চাইলেই পাব নাকি?'

'আমি যদি আদায় করতে পারি?'

'তার থেকে যা দেবে তাই লাভ।'

'অর্ধেক দেব।'

সবই দিয়ে দেব তোমাকে, বলতে গিয়ে চুপ করে আবদুলের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাল।

'আর রাজকন্যা?'

শেয়ালের লোভ আবদুলের চোখে।

সে-চোখে চোখ রেখে একটা কুটিল হাসি হাসল কমলা, বলল, 'রমেশের পরে সে ত তোমারই হবে।'

মদালস একটি ইচ্ছুক যুবতী-শরীর মুঠোয় পেয়ে ছাড়তে ইচ্ছে যাচ্ছিল না আবতুলের। লালসায় লোলুপ আবতুলের তু'হাত বেড়ি দিয়েছিল তাকে। জোর করে নিজেকে সে বেড়ি থেকে ছাড়িয়ে নিল কমলা। বলল, 'একটু দাঁড়াও।'

এখন কমলার পা আর টলছে না। সংকল্পে শক্ত হয়ে উঠেছে পা, সর্বাঙ্গ। আলমারীর ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে একটা চাবি পেড়ে নিয়ে এল সে, আবতুলের হাতে দিয়ে বলল, 'ব্যারাকপুরের বাগান-বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা কর। রমেশকে নিয়ে আমি আসছি।

'অত দূরে নিয়ে যাবে? টাকা যদি শহরে কোথাও রেখে থাকে আবার ত ফিরে আসতে হবে।'

'তুমি ভেবো না।' চোখের তারা তির্যক করে হাসল কমলা, 'টাকার জন্যেই যখন ছুটছি, ওটা ঠিক আদায় করে নিতে পারব। তুমি যাও। তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

তবু ক্ষণকাল দ্বিধা করল আবতুল। তু'পলক ভাবল। তাকাল কমলার দিকে।

আমাকে বিশ্বাস করা উচিত কিনা, ভাবছে নাকি? কমলা মনের মধ্যে উৎকণ্ঠিত হল। চোখের কোণে তাকিয়ে তার চিন্তার গতি অনুমান করছিল কমলা, চতুর চোখে অল্প অল্প হাসছিল, বলল, 'যেতে ইচ্ছে করছে না, না? ভারি লোভী তুমি, কাজটা হাসিল হলে, সমস্ত রাতটাই ত তারপর তোমার হাতে। আবতুলের দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিয়ে কুটিল কণ্ঠে হেসে উঠল কমলা। মোহাবিষ্ট আবতুল আর দ্বিধা করতে পারল না।

আবতুল চলে গেলে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে একটা সুটকেস বের করল কমলা। সব গহনাগাটি ভরল তাতে। ব্যাঙ্কের চেক, নগদ যা টাকাকড়ি ঘরে ছিল, সব নিল। কাপড়-চোপড়ও যা ধরল ঠেসে ঠেসে ভরল।

পাঁচ

রমেশ পচা রক্তের মত রঙের জ্বলন্ত জল গ্লাসে ভরে ছু'হাতে শক্ত করে ধরে বুঁদ হয়ে আছে।

'রমেশদা।'

কমলা তার কাঁধে হাত রেখে ডাকল।

সাড়া দিল না রমেশ। কমলা ছু' কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল তাকে।

তখন চমকে উঠল রমেশ। রক্ত চক্ষু অর্ধেক মেলে তাকাল।

'আরও দেবে নাকি দাও।' গ্লাসের সবটা মদ একবারে গলায় ঢেলে গ্লাস বাড়াল। 'দাও।'

একটু পরেই অধৈর্য হয়ে তাকাল। কমলার দিকে গ্লাস বাড়িয়ে ধরল।

'কই ঢাল।'

তখন দেখল কমলাকে। চোখ বড় হল।

'কে কে?' স্খলিত গলায় বলল, 'কমলা তুমি।'

মাথা কাত করে দিল কমলার কোলে।

'ওরা আমাকে খুন করবে।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রমেশ।

রমেশের চুলে আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কঠিন গলায় কমলা বলল, 'কমলা বেঁচে থাকতে তোমার গায়ে হাত তুলবে এমন শক্তি কারও নেই, ওঠ।'

বান-ভাসি মানুষ যেমন করে একগাছি খড় ধরবার জন্য

ব্যাকুল আগ্রহে হাত বাড়ায় তেমনি করে দু'হাতে কমলার গলা জড়িয়ে ধরল রমেশ, 'চল।'

তারপর কী কথা বলতে গিয়ে কমলার মুখের দিকে চেয়ে চোখ বুজল।

একটা বয়কে ডেকে দু'জনে মিলে তাকে গাড়িতে এনে তুলল কমলা।

খ

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

কমলা ভুলে গেছে মাত্র মাস আষ্টেক হল সে গাড়ি চালাতে শিখেছে। ষাট মাইল বেগে কমলার গাড়ি ছুটছে। গাড়ির আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন বাতাস আহত পাখির মত গাড়ির মধ্যে আছড়ে পড়ে রমেশের মুখে চোখে ডানা ঝাপটাচ্ছে। বাতাসের দুরন্ত ঝাপটায় রমেশের নেশা কাটল। চোখ মেলে চেয়ে রাত্রির জন্তুর চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে দুঃস্বপ্নের গলায় শুধোল—'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমার এক ট্যাংক পেট্রল যেখানে শেষ হবে। যেখানে রামবিলাস, রামবিলাসের কুকুরগুলি কোনদিন আর তোমার সন্ধান পাবে না।'

গলায় একটা কঠিন সংকল্প উচ্চারণ করল কমলা।

'কমলা কমলা আমি যাব না। কমলা!'

চিৎকার করে উঠল রমেশ।

রমেশের গলার স্বরে কী! বিলাসীর কথাটা চাবুক মেরে গেল কমলার বুকে। ছুরি মারল। চমকে উঠল কমলা। তুমি যাবে না? কেন যাবে না? কিসের পিছু টান তোমার? মুহূর্তের

জন্যে রমেশকে দেখে আবার সামনে তাকাল। বলল—'সে কি তোমাকে যে ওরা মেরে ফেলবে। তুমি কি বাঁচতে চাও না রমেশদা? তুমি কি আমাকে চাও না?' সংকল্পে কঠিন গলা ক্রমশ দ্বিধায় আর্দ্র হয়ে থেমে গেল।

'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই—তোমাকেও আমি চাই কমলা। কিন্তু তার আগে।…' রমেশ ঢোক গিলল। দ্বিধা করল দু'পলক তারপর নিরুপায় গলায় বলল, 'আমাকে একটুখানি সময় দাও। আমি একবার উষাকে দেখে আসি। তার পেটে আমার ছেলে। আমাকে একবার আমার ছেলের মুখ দেখতে দাও। দু'দিন সময় দাও আমাকে।'

'কমলা! কমলা! শুনছ?'

শুনতে শুনতে কমলার হাত স্টিয়ারিঙের চাকায় সাঁড়াশির মত বসে গেল। হায়েনার মত হেসে উঠল কমলা। একটা হিংস্র হিংসায় দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল চোখ।

একটা দুর্বিনীত যন্ত্রণায় কমলা সত্যি যেন হায়েনা হয়ে গেছে।

কী হল কমলার! সাড়া দিচ্ছে না কেন কমলা? কমলা থামছে না কেন?

'কমলা, তুমি কি শুনতে পাও না?'

কান্না হয়ে থামল রমেশের গলা।

রমেশের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন। বিস্ফারিত চোখে রমেশ তাকিয়ে আছে। কমলা কেমন কাঠ হয়ে গেছে। শক্ত মৃত কাঠ। নড়ছে না। চোখের পাতা ফেলছে না। বুঝি নিঃশ্বাসও নিচ্ছে না কমলা। ঝড়ের মত হাওয়া ঢুকছে গাড়িতে। আহত ক্ষিপ্ত হাওয়ার প্রচণ্ড কঠিন আঙুলের চাপে কমলার কী নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে? কমলার শরীরে কী প্রাণ নেই? ওর মৃত শক্ত পায়ের চাপে গাড়ির এক্‌সেলেটারটা কী বসে গেছে! ডুবে গেছে!

ডুবে যাচ্ছে রমেশ। সর্বনাশের কোন্ অন্ধকারে উল্কার মত ফুরিয়ে যেতে চলেছে।

প্রবল প্রচণ্ড আকর্ষণে গাছের কঠিন মূলগুলি যেমন শব্দ করে ছেঁড়ে তেমনি একটা অসহায় কর্কশ প্রতিবাদে পড়্পড়্ পড়্পড়্ শব্দ করে গোঙাচ্ছে অক্ষম টায়ার। ছিঁড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে রমেশের বুকে মুখে আছড়ে পড়ে হাহাকার করছে হাওয়া। হাওয়া না। হাওয়া নয়। অক্ষম টায়ারও না। উষা। উষা। উষা ব্যাকুল হয়ে তাকে আটকাতে চাইছে। আঁকড়ে ধরতে চাইছে। উষা যেন একটা ভীষণ যন্ত্রণায় শূন্য ঘরের মেঝেয় পড়ে গড়াচ্ছে। গোঙাচ্ছে।

রমেশের ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখের সামনে স্পিডো মিটারের কাঁটা তার অস্থির তরাসে বুকের মত কাঁপছে। কাঁপছে আর নিশ্চিত অপঘাতের দিকে থর্থর্ করে এগুচ্ছে ষাট···পঁয়ষট্টি···সত্তর··· পঁচাত্তর·· ···

রমেশ চিৎকার করে উঠল।

আবার চিৎকার করে উঠতে গিয়ে মুখের মধ্যে জিবটাকে আর খুঁজে পেল না···চোখ বুজল।

প্রান্তিক প্রকাশনের অন্যতম স্মরণীয় নিবেদন

ক্রীতদাস

উপন্যাস

যজ্ঞেশ্বর রায়

বিবিধ বিপরীত বোধের তীব্র দ্বন্দ্বে অস্থির এক যুবক তার বিষামৃত চেতনায় জড়িয়ে ফেলেছিল এক অনিকেত যুবতী বধূকে। তারা পরস্পরের অস্তিত্বের গভীরে স্ব স্ব বিশ্বাস.. বারংবার অন্বেষণ করেছে। কিন্তু এই শহর—সভ্যতা—সময় কিংবা আমাদের সত্তার কোন অজ্ঞাত অংশ আমাদের অভিজ্ঞতাকে পুনঃপুন নস্যাৎ করে। ফলত এই অনমনীয় রমণী নিঃশব্দে নিজের রক্তে সিক্ত হয়েছিল এবং সেই পরাজিত যুবক তার রুদ্ধশ্বাস আত্মাকে মক্তি .ত অক্ষমতায় ক্রীতদাস হল।

যজ্ঞেশ্বর রায়ের উপন্যাসে আর পাঁচজন সাধারণ কথাকারদের থেকে আলাদা কিছু বক্তব্য থাকে। এ বক্তব্য আমাদের প্রশ্ন চিহ্নিত সময়ের কিছু কিছু আবক্ত জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে বলয়িত। ক্রীতদাসও তার ব্যতিক্রম নয়। অনাদি নামধেয় বর্তমান উপন্যাসের নায়কটির অস্তিত্বের রুদ্ধশ্বাস জিজ্ঞাসা সমস্ত উপন্যাসটির চতুর্দিকে ছড়ানো· ···

জয়শ্রী। আশ্বিন, ১৩৭২]

মূল্য—পাঁচ টাকা